ঈশ্বর অনুভূতি।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

মূর্খ ও বিজ্ঞলোকের কার্য্য-পরিণাম এতদূর পৃথক। অতএব সেই অচিন্ত্য, ভাবাতীত, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বদর্শী, ভূত ভবিষ্যৎ ও বর্ত্তমান দর্শক-ভগবান যদি অসাধারণ শক্তিবলে কোন নিয়ম এই পৃথিবী চালাইবার জন্য সংগঠিত করিয়া থাকেন, তাহা হইলে উহাদ্বারা এই বিশ্ব ব্রহ্মাণ্ড সৃষ্টিকাল হইতে নিখুঁৎভাবে চালিত হইতে পারিবে না কেন? নিয়মের পরিবর্ত্তন কোন স্থলে আবশ্যক—যেখানে সাধক অবিজ্ঞ ও অপরিণামদর্শী। যিনি অনন্তজ্ঞানের আধার, অনন্তশক্তির প্রস্রবণ, অতীত বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎবিদ তিনি যে নিয়ম একবার সংস্থাপন করিবেন তাহা কি কখনও ভ্রমাত্মক হইতে পারে? এতৎ সম্বন্ধে পাশ্চাত্য পণ্ডিত John Wright তাহার Denials and Beliefs of Unitarians গ্রন্থে যাহা বিবৃত করিয়াছেন, তাহা উদ্ধৃত করিলাম।

"If god arranged the whole of creation in the first instance with infinite wisdom, and has never found it necessary since the commencement to alter the arrangement, this does not prove that His will is not perpetually active in carrying out the great principles of His government. The laws of Nature are the plans according to which God acts. It is the glorious peculiarity of the devine causation, that he perceived the end from the beginning and while ruling the universe on system at the same time this works out the great good for each individual The same will that first called in being the forming of nature continually supports it and maintains its harmonious working and this blesses every creature He has made.

ঋষির এই অমৃতময় সারগর্ভ বাক্য শ্রবণ করিয়াও কি জড়বাদীরা বলিবেন, যে ভগবান পৃথিবী সৃষ্টি করার সময় যে সব অভ্রান্ত নিয়ম সংস্থাপিত করিয়া রাখিয়াছেন, সে সব নিয়ম এই পৃথিবী পরিচালনে সম্পূর্ণ উপযোগী নহে? ভগবান পৃথিবীর সর্ব্বাবস্থাবিদ্ কাজেই তিনি যে সব নিয়ম সংস্থাপন করিয়াছেন তাহা প্রকৃতির সর্ব্বাবস্থার অনুকূল বলিয়াই পরিবর্ত্তন অনাবশ্যক। এই জড়বাদীরাই বলেন যে প্রকৃতই যদি ঈশ্বরের সত্ত্বা স্বীকার করিতে হয়, তাহা হইলে তদ্‌রচিত নিয়মাবলীর সময় সময় পরিবর্ত্তন হইলে প্রাণী-মাত্রেরই উপকার হইতে পারে, এবং

তিনি যে চৈতন্যময় তাহাও আমরা বিশেষরূপে উপলব্ধি করিয়া থাকি। জড়বাদীদের এই উক্তি কি যথার্থ? ভগবান নিয়মবলে প্রকৃতিকে চালিত করিতেছেন, সেই নিয়মাবলিকে কার্য্যকারী করিবার জন্য যে শক্তি প্রদত্ত হইতেছে, ঐ শক্তি যদি কোন সময় অপহৃত হয়, তাহা হইলে কি পৃথিবীর নিয়ম-বিপর্য্যয় ঘটে না? ভগবান প্রত্যেক পত্র ও পুষ্প সৃষ্টি করিয়াছেন, প্রত্যেক অম্বুবাহ, মলয়, ও বারিধারা পরিচালন করিতেছেন, প্রত্যেক গ্রহ, উপগ্রহ, চন্দ্র ও সূর্য্যকে তাহাদের নির্দ্দিষ্ট স্থানে আজ্ঞাবলে আবদ্ধ রাখিতেছেন, তিনি দহ্যমান অগ্নি, প্রাণহারী বিষ, তরঙ্গভঙ্গ-ভীষণ বারিধি সৃষ্টি করিয়াছেন, এই সমস্ত সৃষ্ট পদার্থের ক্রিয়া ও শক্তি আবহমানকাল হইতে জ্ঞাত হইয়া সংসার-সাগরে পাদক্ষেপ করিতেছ, যদি কোন সময়ের জন্য তাঁহার নিয়মটুকু পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে তুমি কি অজ্ঞান-অন্ধকারে ডুবিয়া যাও না? যদি তিনি তোমার অজ্ঞাতে একটা নূতন নিয়ম সংস্থাপন করেন যে, কিছুকালের জন্য তুমি উত্তাল-তরঙ্গ-বিক্ষুব্ধ-সমুদ্র-বক্ষে একখানি জীর্ণ ভেলা ভাসাইয়া সমুদ্র অতিক্রম করিতে পারিবে, বিষ তোমার নিকট অমৃত-তুল্য কার্য্যকারী হইবে, পুষ্পের ঘ্রাণ বিষধর-ভুজঙ্গ দংশনের ন্যায় তোমার শরীরে ক্রিয়া করিবে, অগ্নি তোমাকে সুশীতল করিবে, শীত তোমাকে উত্তাপ দান করিবে, বসন্ত-কাল তোমার নিকট বর্ষার বারিধারা সৃষ্টি করিবে, তাহা হইলে তুমি এই নিয়ম-বিপর্য্যয়ে কি পূর্ব্বের ন্যায় সুখী হইতে আশা করিতে পার? আব্রহ্মকাল হইতে পৃথিবী যে নিয়মে চালিত হইতেছে, তাহা তুমি দিন দিন বিদিত হইয়া জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করিতে সুযোগ পাইতেছ, তাহার জন্য তোমার জীবন সর্ব্ব সময় সর্ব্ব রকম আক্রমণ হইতে রক্ষা করিতে পারিতেছ, যদি হঠাৎ এই প্রকৃতির কোন নিয়ম পরিবর্ত্তিত হয়, তাহা হইলে তোমার শিক্ষার যেরূপ অন্তরায় হইবে, তদ্রূপ জীবন-ধারণের পথেও শত শত অনতিক্রমণীয় বিপদ্-ছায়া আসিয়া তোমাকে গ্রাস জন্য মুখ-ব্যাদান করিয়া থাকিবে। তুমি কাহার নিকট উপদিষ্ট হইয়া পাদক্ষেপ করিবে? ভগবান যদি প্রতিনিয়ত তাঁহার নিয়মাবলীর পরিবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে এখন যেটা তোমার জীবন যাপনের পথে সুবিধা দান করিতেছে, কয়েকদিন পরে সেটা তোমার নিকট বিষম অসুবিধা দায়ক বোধ হইবে। আবার বর্ত্তমানে যে নিয়মটা অসুবিধা [illegible] পরিবর্ত্তন করিয়া লইয়াছ সেইটাই কিছুদিন পরে অসুবিধায় প্রবর্ত্তিত হইবে।

এইরূপ পৃথিবীর নিয়ম যদি ক্রমাগত পরিবর্ত্তিত হয় তাহা হইলে কি সংসার জ্ঞানী, মূর্খ, যোগী, ভোগী, দূরদর্শী ও অদূরদর্শী সকলের নিকট তুল্য শঙ্কাজনক হয় না? তাই দয়াময় ভগবান তোমাদের মঙ্গলের জন্য—তোমাদের শিক্ষার জন্য তোমাদের নিকট প্রাকৃতিক-শক্তি জ্ঞাপন করার জন্য তাঁহার সৃষ্টি-কৌশল ও নিয়ম-পদ্ধতি অপরিবর্ত্তিত রাখিয়া ক্রিয়া করিতেছেন। তোমরা

বলিয়া থাক যে, তাঁহার নিয়মের ব্যত্যয় ঘটিলে তোমাদের প্রতি কারুণ্য প্রদর্শিত হইত, একথা যে ভুল ইহা দ্বারা কি তাহা বিনির্গত হইল না? তিনি তাঁহার নিয়মের এককণা ভাল করিলে কখনই তোমাদের প্রতি অনুরক্তি প্রদর্শিত হইত না. এত যে তিনি শ্রেষ্ঠ—এত যে তিনি অভ্রান্ত—তাহাও কল্পিত হইত না।

অনেক সময় আমরা পুণ্যাত্মার ক্লেশের কারণ ও পাপীর সুখের উপকরণ সমাগত দেখিয়া ঈশ্বরের দয়ার উপর দোষারোপ করি, মনুষ্যগণ যে দুঃখ ভোগ করে, ইহা কি ভগবানের নিয়ম অপরিবর্তনীয় বলিয়া, না ভগবানের নিয়ম-পালনে উদাসীন বা বিমুখ বলিয়া?

আমাদের শরীর, মন ও আত্মা এত শুভাকাঙ্ক্ষী বন্ধু যে, কিরূপভাবে জীবনটাকে চালাইয়া লইয়া গেলে,আমরা সুখের ক্রোড়ে বিশ্রামলাভ করিতে পারিব তাহা তাহারা সাধারণতঃ বলিয়া দিয়া থাকে। উহাদিগের বাক্য মানিয়া যদি আমরা আমাদিগকে শাসিত করি, তাহা হইলে কিছুদিন পরে আমরা বুঝিতে পারি—ভগবান আমাদিগকে কিরূপভাবে শাসন ও রক্ষণ করিতে চাহিতেছেন। যখনই আমরা শরীর মন ও আত্মার পরামর্শানুযায়ী চালিত না হই—অতিরিক্ত পরিশ্রম দ্বারা শ্রান্ত হইয়া পড়ি, তখনই আমরা দুঃভোগ করিতে বাধ্য হইয়া থাকি। মনুষ্য মণ্ডলী তাহাদের স্বেচ্ছাচারিত্ব ও মূর্খত্বের জন্য যে সব কষ্ট পায়, তাহা যদি দূরীকৃত হয়, তাহা হইলে এ জগতে ক্লেশের পরিমাণ বহু পরিমাণে হ্রাস হইতে পারে।

যে ক্লেশটা আমরা ঈশ্বর দত্ত মনে করি, এবং যাহা দূর করা আমাদের সাধ্যাতীত বোধ হয়,তাহাই আমাদের ভবিষ্যৎ-জীবনের শিক্ষকরূপে পরিগণিত হইয়া থাকে। দুঃখ ও ক্লেশ আমাদের সর্ব্বস্ব ধ্বংস করার জন্য সমুপস্থিত হয় না। তাহারা যাহা লইয়া যায়, এবং যাহা রাখিয়া যায়, যদি ন্যায্যভাবে পরিমাপিত হয়, তাহা হইলে আমরা জ্ঞাত হইতে পারি যে উহাদের দ্বারা আমরা প্রভূত শিক্ষাপ্রাপ্ত হইতেছি।

যখন আমাদের চরিত্র বল ও ধর্ম্মরক্ষার শক্তি বর্দ্ধিত হয়, তখনই আমরা প্রকৃত উন্নত দুঃখ কষ্ট, অভাব ও বিঘ্নের সঙ্গে বিবাদ করিয়া জয়লাভ করিতে পারিলে, আমাদের চরিত্রে ও মনে অপরিসীম-শক্তির আবির্ভাব হয় না কি? যদি কোনদিন আমরা আমাদের সম্মুখে দুঃখ ও কষ্টের ভয়াবহ মুখ না দেখিতাম, তাহা হইলে কি কখনও আমরা শিক্ষারাজ্যে প্রবিষ্ট হওয়ার পথ নিরীক্ষণ করিতে পারিতাম? যে যত কষ্টের মুখ দেখিয়াছে, সে তত শিক্ষার ভাণ্ডার পূর্ণ করার উপকরণ প্রাপ্ত হইয়াছে। যে সব লোক এ সংসারে জন্মগ্রহণ করিয়াই বিনা আয়াসে সমস্ত সুখের সামগ্রী প্রাপ্ত হয়, তাহাদের মধ্য হইতে তুমি কয়জনকে বাছিয়া শ্রেষ্ঠ লোকের শ্রেণীতে ভুক্ত করিতে পার? যাহারা কর্ম্মক্ষেত্রে যত বাধা-বিঘ্ন পদদলিত করিয়া সংসারের ঝঞ্ঝাবাত তুষারপাত, বারিধারা সহনক্ষম হিমাচলের ন্যায় উন্নত শীর্ষ হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিতে সক্ষম

হইয়াছে, তাহারাই জগতে বিজ্ঞ বলিয়া আদৃত হইতেছে।

আমরা শিক্ষাধান্ত করার জন্যই দুঃখের অমানিশা ও সুখের শারদীয় কৌমুদী-তরঙ্গে নিক্ষিপ্ত হইতেছি। যাহারা এই দুইটি ভাবের গভীরত্ব হৃদয়স্থ করিতে পারে, তাহারা সচ্চিদানন্দ ভগবানকে নির্মমতার আধার বলিয়া ব্যাখ্যা করে না। তাহারা তাঁহার চির-প্রেমের উজ্জ্বল-মূর্ত্তি দর্শন করিয়া নয়ন ও মন রঞ্জিত করে।

আমাদের সুখের আশা পরিতৃপ্ত হয় না বলিয়াই ভগবানকে নির্দ্দয় বা অস্তিত্ব-বিহীন বলিয়া সময় সময় বর্ণনা করিয়া থাকি, তিনি আমাদিগকে প্রতিনিয়ত সুখী করার জন্য যে সমস্ত উপভোগ্য জিনিষ দিয়াছেন, তাহা সৎভাবে উপভুক্ত হইলে কখনই আমরা তাঁহাকে নির্দ্দয় বলিতে পারি না। যে কোনদিন মানবের প্রতি ভগবানের নিরবচ্ছিন্ন প্রেম অনুভব করিতে পারে নাই, তাহার নিকট তাঁহার মহিমাকীর্ত্তন বড়ই ক্লেশদায়ক কার্য্য। বালকবালিকাগণ যেরূপ প্রমাণ প্রয়োগ না পাইয়া তাহাদের চির-কল্যাণময়ী—স্নেহপালিনী জননীর ভাল বাসায় দৃঢ়-বিশ্বাস পূর্ণ, তদ্রূপ প্রত্যেক হৃদয়ই সচ্চিদানন্দ পরমব্রহ্মের অনুভূতি লাভ করিয়া তাহাতেই বিশ্বাসপূর্ণ হইতে পারে। তাঁহার সত্তা নিরূপণের জন্য আবার যুক্তি-প্রমাণের আবশ্যক কি? প্রত্যেক লোক যদি তাঁহাকে অনুভব করিতে চেষ্টা করে, তাঁহার দয়ার জন্য প্রযুক্তকণ্ঠে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করে, তাঁহার আদেশ-পালনও তাঁহার উপর নির্ভর করিতে শিক্ষা করে, তাহা হইলে সকলে নিশ্চয়ই কোন না কোন সময় ভক্তবীর অর্জ্জুনের ন্যায় বলিবার যোগ্য হয়।

"ত্বমক্ষরং পরমং বেদিতব্যং
ত্বমস্য বিশ্বস্য পরং নিধানং।
ত্বমব্যয়ঃ শাশ্বত ধর্ম্মগোপ্তা
সনাতনস্ত্বং পুরুষো মতোমে॥"

সহ সম্পাদক।

ভবিতব্য।

(সত্য ঘটনা অবলম্বনে লিখিত)

[১]

আমার পিতা-ঠাকুর প্রায় ৪ বৎসর হ'ল স্বর্গে গেছেন, তাঁহার মৃত্যুতে আমার প্রথমে একটু ভয় হয়েছিল, যে কি করে সংসার চালাব; কিন্তু সে ভাবনা আর রইল না, মামারা সংসারের ভার নিলেন, আমরা তিনটী ভাই ও একটী ভগিনী; মামারা ভগিনীটির বিবাহ দিলেন, মনে ভাবলুন এই বার নিশ্চিন্ত হলুম। কিন্তু তিন বৎসর না যেতে যেতে ভগিনীটি বিধবা হয়ে আমারই স্কন্ধে চাপল, ভাবনার অস্থির হলুম; এবার চাকরীর সন্ধানে ঘুরতে লাগলুম; ঈশ্বরেচ্ছায়

৩০৲ টাকা বেতনের একটি চাকরীও জুটিল, মনে মনে ঈশ্বরকে ধন্যবাদ দিলুম।

একদিন শুনলুম আমার মাতাঠাকুরাণী আমার বিবাহের জন্য উদ্যোগ করেছেন, মনে বড় আনন্দ হোল,—কিন্তু এ আনন্দ স্থায়ী হলো না, কারণ যখন ভাবলুম যে, বিবাহ হলেই দু চারিটি ছেলে হবে, তখন কি করে সংসার চালাব, এই সামান্য চাকুরী করে আজকালের দিনে কি এত বড় সংসার চালান যায়? মাকে বললুম"মা আমি বিবাহ করিব না", মা সে কথায় কর্ণপাত করিলেন না; আমি বেগতিক দেখিয়া আস্তে আস্তে বাড়ী থেকে পালালুম, কত দেশ বিদেশ ঘুরে মনে এক অনির্বচনীয় আনন্দের উদয় হলো। আমি যখন আগরায় আছি তখন একদিন হঠাৎ এক তেজপুঞ্জ সন্ন্যাসির সহিত সাক্ষাৎ হল, তাঁকে বললুম, 'আমাকে শিষ্য করবেন!" সন্ন্যাসী আমার অল্প বয়স দেখে বল্লেন—"বৎস!" গৃহে ফিরে যাও, তোমার এখনও সময় হয় নাই" আমি তাঁর কথা শিরোধার্য্য করলুম। বাড়ী ফিরে এলুম। দেখলুম মা বসে বসে কাঁদিতেছেন, মাকে গিয়ে প্রণাম করলুম। আমাকে হঠাৎ সন্ন্যাসিবেশে দেখে মা মূর্চ্ছিত হলেন, তখনি তাঁর মুখে জল দিয়ে বাতাস করে চৈতন্য সম্পাদন করলেম। মা বললেন "ছি বাবা এমন করে বাড়ী ছেড়ে যেতে আছে" মার চরণ ধরে বল্লেম---"আর কখন যাবনা।"মা আশ্বস্ত হলেন। চাকরীর জন্য আমার পুরাতন অফিসে গেলাম—সাহেব আমায় বড় ভাল বাস্‌তেন.তিনি বল্লেন,—"শৈলেন বাবু এতদিন কোথায় ছিলেন," তাহাকে মিথ্যা বলিলাম যে, পশ্চিমে হাওয়া বদ্‌লাইতে গিয়াছিলাম। তিনি তাই জেনলেন এবং আমি চাকরি করব কি না তাই জিজ্ঞাসা করলেন, আমি চাকরীর জন্যই এসেছি সে কথা আর সাহেবকে বলিলাম না, 'প্রকাশ্যে বলিলাম "যদি দেন তো করতে পারি।" তিনি তখনই আমায় পূর্ব্বপদে অভিষিক্ত করলেন।

[২]

হঠাৎ শুনিলাম কাল আমার বিয়ে, আজ গায়ে হলুদ, শুনেই আমি আশ্চর্য্য হয়ে গেলাম। কারণ আমি ইহার বিন্দুবিসর্গ জানতে পারি নাই। এবার বাড়ীর সকলে আমার উপর বিশেষ দৃষ্টি রাখতে লাগলেন, আমার বউদিদিরা এসে গায়ে হলুদ মাখিয়ে দিলে। বলিতে ভুলিয়াছি আমার এক খুড়া আছেন, তাঁর ৮ছেলে সকলেরই বিবাহ হয়েছে। আমার বড় বউদিদি আমাকে বড় ভাল বাসতেন, তিনি বললেন ছিঃ শৈলেন এখনও ছেলেমানুষী গেল না, বলি বে'র নাম শুনে পালিয়েছিলে কেন? আমি লজ্জার আর কথা কইতে পারলুম না।

আমোদ আহ্লাদে সে দিন কেটে গেল, আজ আমায় বিবাহ করতে যেতে হইবে; মনে বড় চিন্তা হোল। জানি না হয়ত একটী সিকনিপড়া কুৎসিতের সহিত আমার বিবাহ হইবে মন বড় অস্থির হলো। এমন সময় আমার মেজ ভাই দেবেন এলো, দিব্য ফুটফুটে ছোকরা, আমারই বয়েসী সে গভর্ণমেণ্ট অফিসে তার শ্বশুরের কাছে কর্ম্ম করে, আমাকে ভাবান্বিত দেখে বল্লেন শৈলেন

ভাবছ কি, যা ভাবছ তা নয়, তোমার কোন ভয় নেই—"মেয়েটি দেখতে বেশ সুন্দরি" আমি মনের ভাব লুকিয়ে একটু হেসে বললুম এ ভাবনায় আমার ঘুম হচ্ছে না" অফিস কামাই হল, গেল্লে সাহেব কি বলবে কিনা তাই ভাবিতেছিলাম। সে বললে ন্যাকা কথা কিনা উনি যেন কিছু জানেন না, আমি তোমার সাহেবকে বলে এসেছি। দেখতে দেখতে সন্ধ্যা হয়ে এল আমার বড় বউদিদি সাজাতে বসে গেলেন। তিনি বড় লোকের মেয়ে আমাকে বেশ করে সাজালেন। রাত্রি ৮টা বাজতেই আমাদের দরজায় ৩।৪ খানা ক্রহাম ও ফিটন এসে লাগল দেখিলাম তার মধ্যে একখানি দিব্য সাজান, শুনলুম ঐ গাড়ীতেই আমাকে যেতে হইবে। যাবার সময় হয়ে এল। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করলেন—"বাবা কোথা যাচ্ছ" আমি আস্তে আস্তে বলিলাম "আপনার দাসী আনতে যাচ্ছি।"

আস্তে আস্তে গিয়ে গাড়ীতে উঠলুম, আমার ছোট ভাই ছুইটী আমার পাশে বসল এবং বাড়ীর আর সকলে ও বরযাত্রীরা অন্য গাড়ীতে গেলেন। দেখতে দেখতে আমাদের যুড়ি একটা খুব মস্ত গেটওয়ালা বাড়ীর সামনে গিয়ে দাঁড়াল, বাড়ীর ভিতর থেকে একটী গোল উঠল বর এযেছে, বর এযেছে, তখনই হুলিধ্বনির সহিত শাঁক বেজে উঠল। আমাকে একজন লোক এসে কোলে করে নামিয়ে নিয়ে গেল। সভায় গিয়ে বসলুম বাড়ীর মেয়েরা উকি ঝুকি মারিতে লাগিল। দেখলুম বেশ সুন্দর চকমিলান বাড়ী দেখে বোধ হল পরিবারও অনেক। দেখতে দেখতে লগ্নের সময় হয়ে এল আমাকে বাড়ীর ভিতর নিয়ে গেল কিন্তু ভাগ্যক্রমে আমার মেজভাই দেবেন সঙ্গে সঙ্গে গেল স্ত্রী-আচারের জন্য সুন্দরীর পাল চারিদিকে ঘিরে দাঁড়াইল আমি লজ্জায় মাথা তুলতে পারলুম না। আমাকে একজন রমণী বরণ করিতেছেন এমন সময় একটি ১৫।১৬ বৎসরের যুবতী এসে আমার মাথা ঠুকে দিল, বড লাগল। আমার ভ্রাতাকে সেখানে দেখে তারা আপত্তি করলে, কাজে কাজেই তাকে সরে আসতে হল। আমি বড় গোলে পড়িলাম, কেহ বা কাণ ধরে টেনে আনে, কেউ বা চিমটি কাটে এই রকম করে বড় জ্বালাতন করে তুল্লে সম্প্রদান আরম্ভ হোল পুরোহিত গোটাকতক মন্ত্র পড়ে দুটী জীবন এক করে দিলেন। আমি তার এক বর্ণও বুঝতে পারলেম না।

(৩)

আমাদের বাড়ীর সকলের খাওয়া দাওয়া হয়ে গেছে তাঁরা বাড়ী আসার উদ্যোগ করছেন। আমি আমার ছোট ভাইকে ডেকে বল্লুম "আমি এখানে একলা থাকতে পারব না" সে ঐ কথা সকলকে বল্লে, তাঁরা হেঁসে উঠলেন ও বল্লেন, আজ সবই সহ্য করতে হবে। কি করি, উপায় নাই দেখে চুপ করে রইলুম। তাঁরা আমাকে সেই স্ত্রীমণ্ডলীর ভিতর একলা রেখে চলে এলেন। এইবার আমি বাসরে এসে বসলুম, সুন্দরীর ঝাঁক আমায় ঘিরে বসিল, এবং নানাপ্রকারে উত্যক্ত করিতে লাগিল। আমি মনে

করলুম, পর পুরুষের সহিত এরূপ ব্যবহার করিতে এদের একটু লজ্জা হয় না, ছিঃ গলায় দড়ী! এইবার গান গাইবার জন্য জ্বালাতন করে তুল্লে. একজন বলে উঠল "আচ্ছা সরি" তুই আগে গা তারপর বর গাইবে" সুন্দরী আর কথা কহে না, শেষে সকলেই তাহাকে গান গাইবার জন্য পীড়াপীড়ি আরম্ভ কল্লে, তখন সে গ'হল।

সে আশা দিযে কেন আসেনা।
ভালবাসা পেযে ভালবাসে না॥
আছি কত আশা দিযে আশা-পথ চেযে,
কত সবমে মরম-বেদনা লুকাযে,
আমি কেঁদে মরি সে কেন ফিরে চায না।
নযনে নয়নে হলে, কত কথা বলে ছলে,
নযন অন্তরে গেলে, কেন সব যায় ভুলে,
সদাই দেখিতে সাধ তবু দেখা দেয না।
আশাপথ চেযে আছি যেন চাতকিনী,
চির-বিবহিনা তার প্রেমাধিনী
নবীন-নারদ কেন তবু দেখা দেয না।

এমন সময়ে একজন বর্ষীয়সী রমণী এলেন তাঁকে দেখেই সকলে একেবারে চুপ হ'য়ে গেল, আমিও বাঁচলুম। তিনি আমার দাড়ী ধরে ব'লুলেন, 'কেমন ভাই পছন্দ হ'যেছে তো, অনুমানে বুঝলুম ইনি আমার দিদি শাশুড়ী, লাজ লজ্জার মাথা খেয়ে বুঝলুম 'নিমিষের দেখায কি আর আশা পুরে" তিনি তখন আমায় স্ত্রীর ঘোমটা খুলে দিলেন, বক্র দৃষ্টিতে দেখলুম, বেশ ফুটফুটে। চোকগুলি টানা টানা, যোড়া ভ্রূ. নাকটী টিকল গণ্ড গোলাপী আভায় রঞ্জিত, রংটিও যেন চাঁপাফুলের মত, মোটের উপর দেখতে মন্দ নয় আমি চোক্ ফিরিয়ে নিলাম. আমার দিদি-শাশুড়ী আবার বল্লেন "কেমন পছন্দ হয়েছে তো" আমি এবার লজ্জায় আর মাথা তুলতে পারলুম না. চুপ করে ব'সে রইলুম. একজন বলে উঠল "পছন্দ হবে নাত কি; বনো কি আমাদের দেখতে মন্দ" এখানে জানিয়া লইলাম আমার স্ত্রীর নাম মনোরমা বা মনোমহিনী যা হোক একটী কিছু হবে। দেখতে দেখতে ফরসা হ'য়ে এল, একজন অপরিচিত যুবক এসে আমার হাত ধরে তুলে নিয়ে গেল, আমি মুক্ত বায়ুতে এসে হাঁপছেড়ে বাঁচলুম পরে পরিচয় পেলাম যে ঐ যুবক সম্পর্কে আমার শালা।

আজ আমাদের বাড়ীতে বৌ-ভাত, বাড়ীতে লোকে লোকারণ্য, কত লোক আসচে, যাচ্চে তাহার ঠিক নাই, এমন সময় আমার শ্বশুরবাড়ী থেকে ৩০।৩৫ জন লোক ভার নিযে এল, শুনলুম ফুলশয্যা এল। ফুলশয্যা আবার কি! এটির কিছু অর্থ বুঝতে পারলুম না। শেষে যখন সব লোক চলে গেল, তখন আমার বউদিদি এসে উভয়কে ফুলের হার, বালা, তাগা, প্রভৃতি পরিয়ে দিয়ে ফুলের বিছানা পেতে আমাদের উভয়কে ঘরের মধ্যে রেখে শিকলি টেনে দিলেন, তখন বুঝতে পারলুম যে এরই নাম—ফুলশয্যা।

* * * *

প্রায় ২ বৎসর হোল আমার বিবাহ হযেছে. এখন আমি বেশ চাকরি বাকরি করছি, মাঝে মাঝে শ্বশুরবাড়ীও যাই। আমি তাদের এক জামাই বলে তাঁরা খুব যত্ন করেন, মোটের উপর এখন বেশ সুখে আছি। কোথায় সন্ন্যাসী সেজে চলে গেছলুম, এখন একেবারে ঘোর সংসারী, সকলই সে বিধাতার ইচ্ছা, তাহার উপর হস্তার্পণ করে কাহার সাধ', এরই নাম ভবিতব্য।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত।

সর্ব্বজন প্রিয় মহারাজা সূর্য্যকান্তের হটাৎ লোকান্তরগমনে বোধ হইল যেন আকাশ হইতে একটা উজ্জ্বল নক্ষত্র খসিয়া পড়িল। বিগত ৪ঠা কার্ত্তিক মঙ্গলবার ময়মনসিংহ বাসীর পক্ষে একটি নিদারুণ স্মরণীব দিন, মহারাজাব আকস্মিক মৃত্যু সংবাদে আজ তাহাদেব প্রাণে কিরূপ আঘাত লাগিতেছে, তাহা ভাষায় ব্যক্ত করা আমার ন্যায় লেখকের সাধ্যায়ও নহে। তবে আজ না লিখিয়াও লেখণীকে সান্ত্বনা করিতে পারিলাম না।

বিগত ৪ঠা কার্ত্তিক মঙ্গলবার রাত্রিতে ময়মনসিংহেব সুবিজ্ঞ অধীশ্বব, ভাবতের প্রিয়তর্ম পুত্র মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুব বৈদ্যনাথ দেওঘবে জীবন লীলা সাঙ্গ করিয়াছেন, যিনি প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী কাল যাবৎ ময়মনসিংহের জীবন স্বরূপ ছিলেন, যাহার উজ্জল রশ্মিতে, সমগ্র বাঙ্গালা দেশ আলোকিত ছিল, সেই দীপ্তিমান সূর্য্য গত মঙ্গলবারে অস্তমিত হইয়াছেন।

আমরা প্রথমতঃ অস্পষ্টভাবে এই ভীষণ সংবাদ শুনিয়া সম্পূর্ণ বিশ্বাস কবি নাই, কিন্তু আজ নিশ্চযই জানিলাম সত্যই আমাদেব পর্ব্বতের চূড়া ভাঙ্গিয়াছে আমবা পিতৃহারা হইয়াছি, এমন শোক সংবাদ কখন মিথ্যা হয় না। আমাদের দেশের অদৃষ্ট নিতান্ত মন্দ, নচেৎ এমন দুঃসময়ে এরূপ রত্ন হারাইব কেন?

ময়মনসিংহ আজ শোকাচ্ছন্ন। মূহুর্ত্তে বিদ্যুৎবলে এই সংবাদ নগবে এবং পল্লীতে প্রচাবিত হইতে লাগিল, প্রভাতে উঠিয়া দেখি নগরবাসী, প্রবাসী, পল্লীবাসী প্রত্যেক প্রাণীব মুখেই বিষাদ কালিমা রেখা পতিত হইযাছে। যেন সকলেই অতিরিক্ত গভীর শোকে অভিভূত হইয়াছে।

আজ ময়মনসিংহ সহরে সমগ্র দোকানেব কপাট বন্ধ, কাহাবও কার্য্যে উৎসাহ নাই। ব্যবসাযীব মুখে ব্যস্ততাব চিহ্ন বিন্দু মাত্রও দেখা যায় না। স্কুল, বিচারালয প্রভৃতি বন্ধ, নগর নিস্তব্ধ, জন-সাধাবণ স্তম্ভিত, ময়মনসিংহেব প্রিয ম্যাজিষ্ট্রেট মেঃ ব্ল্যাকউড এই ভীষণ সংবাদ পাইয়া সেইদিন কাছারী বন্ধ দিবাব আদেশ প্রদান কবিযাছিলেন।

মহারাজা সূর্য্যকান্ত আচার্য্য বাহাদুরের লোকান্তরে সেদিন আমাদের ক্ষুদ্র পল্লি "রূপসীতে, আমাব স্বরগীয মাতৃদেবীরনামীয় 'জয সুন্দবী" স্কুল প্রাঙ্গনে জনসাধাবণেব একটী শোক সভা আহূত হইযাছিল। সভাতে উপস্থিত ছিলেন স্থানীয সম্ভ্রান্ত তালুকদার শ্রীযুক্ত জগচ্চন্দ্র চৌধুরী, শ্রীযুক্ত মহিম চন্দ্র চৌধুবী, শ্রীযুক্ত হবিকান্ত মৈত্র, শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ চক্রবর্ত্তী প্রভৃতি তাঁহাদেব শোক পূর্ণ বক্তৃতা একান্ত প্রশংসনীয। স্বর্গীয মহারাজ সূর্য্যকান্তের "গুণকীর্ত্তন" নামে একটী ক্ষুদ্র কবিতা এই অধম লেখক কর্ত্তৃক পঠিত হইয়াছিল। মহারাজের অভাবে সকলেরই শোকাতুর বদন কালিমাময়

হইয়াছিল।. অতঃপর সভা ভঙ্গ হইবার পর আমি স্কুলের ছাত্রদিগের মধ্যে স্বর্গীয় মহারাজের শোক- চিহ্ন ধারনের জন্য একদিন ঐ স্কুলটী বন্ধ দিবার আদেশ দিয়াছিলাম।

মহারাজা সূর্য্যকান্তের ন্যায় তীক্ষ্ণবুদ্ধি, নির্ভীক, স্বাধীন চেতা, স্বদেশ বৎসল, কর্ম্ম-তৎপর, অন্য প্রায় দেখিতে পাওয় যায় না। তাঁহার জীবনী অথবা বিস্তৃত কার্য্যাবলীর তালিকা সংগ্রহের চেষ্টায় প্রবৃত্ত হইলাম। তাহা ক্রমে ক্রমে আলোচনার পাঠকবর্গের নয়নগোচর করিতে যত্নবান হইব।

শ্রীবিপিন চন্দ্র চৌধুরী।

সফল স্বপ্ন।

কালি যবে সুপ্ত ছিনু গভীর নিশায়
স্বপ্ন মাঝে স্বপ্নময়ী, লভিয়ে তোমায়
একান্ত বক্ষের পাশে বাহুর বাঁধনে
সুনিবিড়, অমাকাশে যেন কি সাধনে
শারদীয় পূর্ণিমার পূর্ণ শশধর
তৃপ্ত করিবারে হায় তৃষিত চকোর
উদেছিল অকস্মাৎ! সারা প্রাণ দিয়া
মুগ্ধ হৃদি মত্ত ছিল আহরি অমিয়া
আকণ্ঠ করিতে পান, জুড়াইতে জ্বালা
জন্ম জন্মান্তের যেন!
এ সময়ে বালা,
কে ধীরে আঘাত করি রুদ্ধ দ্বারে মোর
আহ্বান করিল 'ওঠ, খোল ত্বরা দোর,
আমি আসিয়াছি হের!" মুক্ত বীণা-রব
যেন মোর মর্ম্ম মাঝে হল অনুভব
মধুর তন্দ্রার ঘোরে, শুধালাম তবু
"কে তুমি" স্বপনে যেন, ভাবিনিত কভু
অমর-বাঞ্ছিত-নিধি হেন অসময়ে
অপার্থিব স্নেহ প্রীতি হৃদি ভরে লয়ে
অযাচিত ভাবে এসে আকুল অন্তরে
দাঁড়াবে ভক্তের ক্ষুদ্র কুটীর—দুয়ারে
প্রেমময়ী!
অচিরেতে সত্য পরিচয়
ভেঙ্গে দিল তন্দ্রালস, উদ্‌ভ্রান্ত হৃদয়
উঠিল আনন্দে নাচি ত্রস্তে খুলিদ্বার কি
হেরিনু, মূর্ত্তি ধরি স্বপন আমার
অদূরে সম্মুখে মোর দাঁড়ায়েছে আমি
বিকাইযে চারিধারে স্নিগ্ধ সুধা রাশি
প্রাণ-হরা নিরুপম! দরিদ্রের ঘরে
কে শুনেছে দেবারাধ্য মহা রত্নাকরে
বসায়েছে মহা মেলা? কে করেছে আশা
শ্মশানে নন্দন তরু, সর্ব্বতাপ নাশা
ফুল্ল পারিজাত মালা?
অয়ি সুকল্যাণি,
অয়ি দেবি, আজি আমি লইলাম মানি'
অসম্ভব একদিন হয যে সম্ভব
অদৃষ্ট ইঙ্গিতে করে, মঙ্গল বৈভব
অমঙ্গল বয়ে আনে!
কিন্তু মোর হায়,
ছিলনাত হেন কিছু সে গাঢ় নিদ্রায়

আনন্দে অর্চ্চনা করি রাতুল চরণ
শূন্য গৃহে শূন্য প্রাণে করিতে বরণ
ত্রিদিব-সম্পদ সম ! কোথা সিংহাসন—
কোথা বারি পূর্ণ ঝারি, কোথা অতুলন
সুগন্ধি কুসুম পুঞ্জ, কোথায় চন্দন
কোথায় প্রদীপ মালা, কোথায় শোভন
ত্রিশীর্ষ দূর্ব্বার দল ? কিছু নাই-নাই—
নীরব নিঝুম স্তব্ধ শুধু চারিঠাঁই
সুষুপ্তি সমুদ্র যেন সকল ধরার
থামাইয়ে অলক্ষিতে স্পন্দন হিয়ার
ভাসাইযে নিযেগেছে সর্ব্ব আয়োজন
তোমার পূজার সখি। সারা প্রাণ মন
উঠিল ব্যাকুল হয়ে ! এত কৃপা যার
সে কি লবে অবাঞ্ছিত ক্রটী অভাগার
সহসা জাগিল চিত্তে, কুজ্ঝটিকা ঘন
ভেদি পলে যেন দীপ্ত সহস্র কিরণ
দেখা দিল অকস্মাৎ ! সমগ্র অন্তরে
তখনি পুলকে পূর্ণ বিনা আড়ম্বরে
নিমু ববি জীবনের মহা শুভক্ষণ
অপূর্ব্ব অচিন্ত্য অতি সফল স্বপন !!

শ্রীজীবেন্দ্র কুমার দত্ত। বি,এ

—(ঃ)—

হৃদয়-হারা।

কণক-কিরণে, আকুল চরণে
সন্ধ্যা নামিয়া আসে,
যে ছিল যথায়, আকাশে ধরায়,
সবে যায় ফিরে আপন বাসে।
ফুলবাস সম, হৃদিখানি মম,
সমীর উড়ায়ে ধীরে,
রাঙ্গা মেঘপানে, কারি সন্ধানে,
নিয়ে যায়, ডাকি চাহেনা ফিরে।
গাগরী কক্ষে, কম্প্র বক্ষে,
বধূরা এসেছে ঘাটে ;
ঘোমটাটি টানি, স্মিত মুখখানি,
কভু নীরপানে, কভু বা বাঁটে।
সলিল-মাঝারে, দেখে যেন কারে
আকাশে বসিয়া চেপে,
মুখ-ছায়া-পাশে, কারি মুখ হাসে,
লহরে লহরে দুলিছে কেঁপে।

সে আমার হিয়া, বাঁশী ফুকারিয়া,
রাখালের মত ডাকি,
সে রয়েছে দূরে, যেথা পাখী উড়ে,
সেও গায় শাখে হইয়া পাখী।
তারকা আসিয়া, উঠে চমকিয়া,
ফুটন্ত হেরি তারে।
আপন স্থানে, দীপ্ত বিমানে,
হেসে উঠে তারি অহংকারে।
আসিলে প্রভাত, মুকুলের সাথ,
বৃন্তে রহে সে ফুটি,
দিবানিশি ধরি, কোথা খুঁজে মরি,
নিভে আসে মোর নয়ন দুটী।
তা'রা সবে ঠেলে, কবে দেবে ফেলে,
কোথায় হারায়ে যাবে ;
বুঝেনা তথাপি, করে লাফালাফি,
কে জানে তাহারা কিসের লাভে ?

শ্রীধীরেন্দ্রলাল চৌধুরী।

মাঝির মৃত্যু।

(১)

সময় হয়েছে মোর এসগো সবে।
এ তনু তরনী আর বাঁধা না রবে,
ফুরায়ে এসেছে আয়ু
অনুকূল বহে বায়ু,
ভরা পালে চলে যাব ত্যজি এ ভবে।
সময় হয়েছে মোর এসগো সবে॥

(২)

বিদায় 'উজানি' নদী, 'কুমুব' আজি,
বিদায় আমার সাথী লহরী বাজি।
বিদায় 'রাজার ঘাট'
বিদায় 'নুতনহাট'
পারে যায় তোমাদের পুরাণো মাঝি।
বিদায় উজানি নদী 'কুমুব' আজি॥

(৩)

বটগাছ! কাঁদে প্রাণ তোমার লাগি,
আজিকে নিকটে তব বিদায় মাগি।
সখা তব গৃহ ছায়,
সুখে ছিনু দুজনায়,
মনে পড়ে কত নিশি কেটেছে জাগি।
বটগাছ কাঁদে প্রাণ তোমার লাগি॥

(৪)

সুদূর দিগন্তে আজ যেতেছে তরী,
বল গ্রামবাসী বল শ্রীহরি হরি।
এ বিদায় নিরমল,
ফেল না নয়নজল,
সলিলে দিযোনা আর তরণী ভরি,
সুদূর দিগন্তে আজ যেতেছে তরী॥

(৫)

আর না কেটেছে নিশা কাঁপে তরণী,
উজানি হতেছে যেন পীত বরনী।
কেটে দাও মায়াডোর,
তরনী ধর না মোর,
বিদায় বিদায় আজ শ্যামা ধরনী!
আর না কেটেছে নিশা কাঁপে তরনী॥

শ্রীকুমুদরঞ্জন মল্লিক। বি এ

শাক্যসিংহের প্রতি।

এসহে তাপসবর
এস এস একবার
বারেক তোমারে চাহি ওহে গুণাধার
এসহে ভারতে পুনঃ হও অবতার।
বারিদ গম্ভীর স্বনে
ডাকি বঙ্গ সুতগণে
পুনশ্চ ভারতে কর সত্যের আহ্বান
এস ফিরে একবার এস মতিমান্

বল দেব বল সবে
বল মৈ সাম্যের রবে
ক্ষত্র হোক বৈশ্য হোক ব্রাহ্মণ সন্তান
করিও না ভেদ জ্ঞান সবার সমান
করিও না দ্বেষাদ্বেষি
রাখিও না রেষারেষি
কুল' মান অভিমান ক্ষত্র শূদ্র জ্ঞান
ব্রাহ্মণ বলিয়া ত্যজ আত্ম অভিমান।
ভুলে যাও ধর্ম্মভেদ
অতি তুচ্ছ জাতি ভেদ
মঙ্গল শঙ্খের ধ্বনি ধ্বনিতেছে শুন
ডাকিছে জননী উর্দ্ধ হাতে পুনঃ পুনঃ।

আয় ছুটে আয় আয়
স্নেহে ডাকিছে মায়
ছোট বড় সকলেই মায়ের সন্তান
মায়ের নিকট তোরা সবাই সমান
আদরে নিবেন অঙ্কে জননী তোদের
আছে কিগো পারাপার মায়ার মায়ের
ধ্রুব তারা জীবনের
করি লক্ষ্য মানসের
মিলন মন্দিরে এস সবে ছুটে যাই
মিল' ছাড়া অন্য পন্থা দেখি নাত ভাই।

শ্রীসুধা কৃষ্ণ বাগচী।

—(ঃ)—

শ্মশান।

১

এই কি শ্মশান বন্ধু, এই কি শ্মশান?—
উত্তাল তরঙ্গ তুলি, তরঙ্গিনী হেলি দুলি,
ছুটিয়া অনন্তপানে করিছে আহ্বান!
বিচিত্র কেতন শিরে, শোভিছে সমাধি তীরে,
অত্যুচ্চ-গগনস্পর্শী হিমাদ্রি সমান,
জ্বলিছে অনন্ত চিতা, প্রকৃতি স্তম্ভিতা, ভীতা,
আচ্ছন্ন অনন্ত ধূমে আকাশ বিমান!
লোলুপা মাংসাশী যত, শকুনি, গৃধিনী শত,
খেলিছে আনন্দে সদা পুলকিত প্রাণ,
এই কি শ্মশান বন্ধু, এই কি শ্মশান!

২

এই কি শ্মশান বন্ধু, এই কি শ্মশান?
চৌদিকে তমসা ঢালা, নিবিড় নিচুল-মালা,
আবৃত করিয়া আছে বল্লরী বিতান!

নাহি সন্ধ্যা, নাহি ঊষা, পূর্ণিমার শুভ্র ভূষা,
পশে না জলন্ত রবি—দীপ্ত দিনমান,
বিশুদ্ধ বসন্তকালে, পল্লবিত তরু-ডালে,
কোকিল ছাড়ে না সুখে সুমধুর তান!
এ ঘোর সমাধি চুমে', এ অনন্ত মরুভূমে,
থাকে না মলয়-বায়ু মৃদু বহমান,
শারদী-প্রভাত-বেলা, করে না সেফালি-খেলা,
রচিয়া বসুধা-অঙ্কে বিচিত্র শয়ান;
আনন্দে করে না কেলি, যুথিকা, চামেলী, বেলী,
অনিলে সুরভি স্নিগ্ধ করিয়া প্রদান,
এই কি শ্মশান বন্ধু, এই কি শ্মশান?

৩

এই কি শ্মশান বন্ধু, এই কি শ্মশান?
খেলিয়া সংসার-খেলা জীবনের শেষ বেলা,
লভে কি মানব এই মহাতীর্থ স্থান?
এই কি সে শান্তি-ভূমি, এখানে কি আমি, তুমি,
লভিব অনন্ত প্রেমে অনন্ত নির্ব্বাণ?
ভুলিয়া বিশ্বের স্নেহ, অলন্ত চিতায় দেহ,
লভিবে কি মহানিদ্রা,—চির অবসান?
এখানে আসিলে হায়, সকলি কি নিভে যায়?
হয় কি মুক্তির পথে আত্মার প্রয়ান?
ক্ষুদ্রত্ব মহত্ব ভুলে', হয় কি এ নদী কূলে,
অসীমে সসীমে পূত সংযোগ মহান?
সংসারের হাহাকার, দারিদ্র্যের অত্যাচার,
ঘৃণার বীভৎসময়ী ভ্রুকুটি-আহ্বান,
এ পবিত্র শান্তি-পুরে, আসিলে রহে কি দূরে?
নিষ্ঠুরতা, ব্যাভিচার চির ম্রিয়মাণ?
এখানে এলে কি হয়, পূর্ণ আত্মা জ্যোতির্ম্ময়,
লভে কি "সোঽহং" নয় মহা আত্ম-জ্ঞান?
আমিত্ব, তুমিত্ব সনে, এক মহা সম্মিলনে
"একমেব দ্বিতীয়ং" করে অবস্থান?

পবিত্র নিস্পৃহ ভাব, হয় কি গো আবির্ভাব ?–
মিশে কি অনন্তে আত্মা চির-জ্যোতিষ্মান ?
বিজয়ী বিষাণ ধরি' "বম্ বম্" শব্দ করি',
এখানে কি ব্যোমকেশ করেন ধেয়ান ?
ললাটে অনন্ত জ্বালা, কণ্ঠ-ভূষা—অস্থি-মালা,
শবাসন ভবেশের এই কি সোপান ?
এই চিতা-ভস্ম-রাশি, সর্ব্বাঙ্গে মাখিলে আসি,
হয় প্রাণায়াম সিদ্ধ—তপস্যা মহান্ ?
এই কি মুক্তির শেষ ? এই কি সে ব্রহ্মদেশ ?
এই কি সে মানবের মহা যোগ স্থান ?
তাই যদি ?—তবে আমি, হ'ব না সে বিশ্বকামী,
করিব এ মহাতীর্থে আত্ম-বলিদান ;
এই মহাতীর্থে থাকি', এই চিতা-ভস্ম-–াখি',
সাধিব অনন্ত-যুগ অনন্ত-কল্যাণ,
এই কি শ্মশান বন্ধু, এই কি শ্মশান ?

শ্রীঅটলবিহারী দাস।

পুরাতন ও নূতন।

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর)

"পুরাতন" কথাটীর ব্যবহার কোন্ কোন্ অর্থে হয়, তাহা বিস্তারিত ভাবে বলিবার স্থান নাই। কথিত ভাষার চাঞ্চল্যে * 'পুরাতন" শব্দটী কখন কখন "অভ্যস্ত", অর্থে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। অভ্যস্ত পদার্থকে আমরা পুরাতন বলিয়া থাকি। যাহা হউক আমরা নূতন ও পুরাতনের যে অর্থ নির্দ্দেশ করিয়াছি সেই অর্থও বিশেষ ভিন্ন নহে। এখন দেখা যাক আমরা নূতনপ্রিয় কেন।

* কথায় আমরা একটী শব্দ অনেক অর্থে ব্যবহৃত করিয়া থাকি। প্রবন্ধের প্রথমাংশে এই কথা লইয়া অনেক আলোচনা করা হইয়াছে। অনেকে চিন্তাকর্ষণ করিবার শক্তির বিভিন্নতা দেখিয়া নূতন পুরাতনের বিভিন্নতা নির্দ্দেশ করিয়া থাকেন বলিয়াই প্রবন্ধের প্রথমাংশ অপরিত্যাজ্য বিবেচনা করা গেল।

আমাদের জ্ঞান পরিবর্ত্তনের ভিতর দিয়া বর্দ্ধিত হয়। যাহারা কেবল মাত্র জঙ্গলাবৃত বন-ভূমিতে বাস করিয়া আসিতেছে, তাহারা জনাকীর্ণ নগর সম্বন্ধে কিছুই জ্ঞাত নহে। অল্পবয়স হইতেই এই জ্ঞানের উন্মেষ হইতে থাকে। যাহা জ্ঞাত নহি তাহা জানিতে আমরা সতত উদ্‌গ্রীব হইয়া থাকি। বালকেরা জল ও ঝটিকার কারণ জানিতে অত্যন্ত উৎসুক হইয়া থাকে। যখন তাহারা এই সকল বিষয় জানিতে পারে তখন তাহাদের একটা শান্তি (Satisfaction) উপস্থিত হয়। যত তাহারা বর্দ্ধিত হইতে থাকে তত তাহাদের জ্ঞান বর্দ্ধিত হয়, সঙ্গে সঙ্গে বিস্তর প্রশ্ন তাহাদিগকে উত্তর জানিতে ব্যগ্র করিয়া তুলে। এইরূপে তাহাদের নুতন জ্ঞান লাভ হয়।

যথায় জ্ঞানলাভ দুষ্কর হয়, সেই স্থানে তাহারা কল্পনার (Imagination) সাহায্য গ্রহণ করিয়া থাকে। এই রূপে আমরা নূতনত্বপ্রয়াসী হইয়া পড়ি। এককার্য্যে চির কাল আনন্দ উপভোগ করি না।

এইরূপে নূতন আকাঙ্খা করিয়া যত আমরা বর্দ্ধিত হইতে থাকি, তত আমাদের পথে কতকগুলি স্বভাবজ ও দৈব প্রতিবন্ধক আসিয়া উপস্থিত হয়। বিশাল পৃথিবীর জ্ঞান ভাণ্ডার অনন্ত, অক্ষয় ও অপরিমেয় সুতরাং আমরা বিশ্বাস করিতে পারি না যে এককালে আমরা আর নূতন কিছু খুঁজিয়া পাইব না। তবে মানবের জ্ঞান সীমাবদ্ধ; সকলে সকল বিষয় আলোচনা করিতে পারে না। তাহার স্বভাব তাহাকে যে দিকে প্রবর্ত্তিত করে, সে সেই দিকে ধাবিত হয়। যে ব্যক্তি সাহিত্য রসগ্রাহী সে হয়ত অঙ্কশাস্ত্রবিৎ নহে; অঙ্ক শাস্ত্র সম্বন্ধে যে সমস্ত নূতন তত্ত্ব সে জানিতে ইচ্ছা করে না. প্রাণীতত্ত্ববিৎ দর্শণ সম্বন্ধীয় নূতনতত্ত্বপিপাসু না হইতে পারে। কোন কোন কবি ঐতিহাসিক নূতনত্ব জানিবার জন্য ব্যগ্র হয় না। ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে, যখন আমরা নূতনের আশায় অনবরত নূতনের পথে ছুটিতে থাকি, তখন আমাদের স্বভাবজ আমাদিগকে বাধা দিয়া একটা নির্দ্দিষ্ট সঙ্কীর্ণ পথে চালিত করিতে থাকে; ইহাই স্বভাবত প্রতিবন্ধক। কেবল স্বভাব (Nature) নহে, যাহাকে আমরা অভ্যাস বলি (habit) তাহাও কখন কখন এইরূপ প্রতিবন্ধকতাচরণ করিয়া থাকে। আমি পল্লীগ্রামবাসে অভ্যস্ত, সহরের নূতন বিষয় জ্ঞানে আমার স্পৃহা না থাকিতে পারে। দৈব প্রতিবন্ধকের কথা না বলিলেও চলে। অকস্মাৎ এমন ঘটনা ঘটিয়া থাকে যাহার দ্বারা আমরা আর নূতনের পথে অগ্রসর হইতে পারি না। আকস্মিক অনর্থপাত, অনীপ্সিত ঘটনা সমূহ কখন কখন আমাদিগকে নূতনের চিত্র পর্য্যন্ত মানসপটে অঙ্কণ করিতে দেয় না। শিক্ষিত যুবা বিশ্বের জ্ঞানভাণ্ডার উন্মুক্ত করিতে পাইল, মনে করিল নিশ্চিন্ত হইয়া সে একবার নূতন তত্ত্বসমূহ আবিষ্কৃত করিয়া অনন্ত যশঃ আহরণ করিবে, কিন্তু সহসা বিপদ সমুদ্রের একটা তরঙ্গ তাহাকে বিচলিত করিয়া দিল, তাহার মানস-সঞ্চিত আশাগুলি

সেই তরঙ্গে ভাসিয়া গেল আর সে ভাবিতে পারিল না, কখনও সে নূতনের পথে যাইতে পারিবে। স্নেহ, মায়া মমতা প্রভৃতির কথা পূর্ব্বে বলিয়াছি; ইহারা এক প্রকার স্বভাবজ প্রতিবন্ধক। ইহারা মানবকে নূতনের পথ হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতে উপদেশ দেয়। তাহার উদাহরণ আমরা পূর্ব্বে দিয়াছি।

এই স্বভাবজ ও দৈব প্রতিবন্ধক নূতনকে নির্দ্দিষ্ট ও সীমাবদ্ধ করিয়া ফেলে। এই জন্য যত আমরা নূতন আকাঙ্ক্ষা করিয়া করিয়া নূতনের পথে অগ্রসর হই যত আমাদের নূতন পুরাতন হইয়া আসে, তত আমরা বুঝিতে পারি নূতনের ভাণ্ডার একটু একটু করিয়া ছোট হইয়া আসিতেছে। এইরূপে যখন আর নূতন খুঁজিয়া পাই না তখন পুরাতনগুলি একে একে নূতনের আভায় অলঙ্কৃত হইয়া আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। এইজন্য জীবনে যখন একটা অবস্থা অথবা মনোভাব বহুকাল ধরিয়া বিদ্যমান থাকে অর্থাৎ যখন আমরা নূতন কিছু পাই না, তখন অনেক পুরাতন কথা মনে পড়ে। এই পুরাতন আমাদের প্রিয় হয় কেন এমন হয় তাহা আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। দুঃখদারিদ্র্যভারাক্রান্ত জীবন যখন একঘেয়ে অসহ্য বলিয়া বোধ হয় তখন স্মৃতিপথে সুখ-সৌভাগ্যের দিনগুলি প্রাঞ্জলরূপে প্রতিভাত হয়।

এখন দেখা যাক বহুকালস্থায়ী একটী ভাবের তাড়নায়, আমরা অনেকগুলি পুরাতনের মধ্যে কোনটী অনুসন্ধান করিয়া লই।

আমরা সকলেই সুখপ্রয়াসী। যে পুরাতন আমাদিগকে সুখ দান করিতে সক্ষম তাহাই আমরা অনুসন্ধান করি,* অনেককাল এক বিষয় আলোচনা করিয়া ক্লান্ত হইলে আমাদের যাহা সেই সময়ে চিত্তাকর্ষক ‡ অতএব নূতন বলিয়া বোধ হয়, তাহা অনুসন্ধান করি। প্রবাসের পর আপনার জন্মস্থান চিত্তাকর্ষক। পাঠাভ্যাসের পর বিশ্রাম প্রিয়। সুখের সময় বিগত জীবনের দুঃখগুলি আলোচনা করিতে ইচ্ছা যায়।

এখন একটী কথা বক্তব্য এই যে, অনেককাল একবিষয় আলোচনার পর যখন আমরা পুরাতনে মনোনিবেশ করি তখন তাহাতে আমরা যে শান্তি অনুভব করিতাম, তাহার অপেক্ষা অধিক শান্তি তখন অনুভব করি।

*মানব সুখপ্রয়াসী এ কথা অনেকে স্বীকার করিবেন না। অনেকে বলিবেন যাহা সুখ দান করে না, তাহা ন্যায় সঙ্গত হইলে মানবের অনুসন্ধেয়। আমরা বলি সুখ কথাটীর অর্থ এস্থানে একটু বিস্তৃত বুঝিতে হইবে। যখন আমরা ন্যায়সঙ্গত একটা বস্তু বা বিষয় অনুসন্ধান করি তখন তাহা দুঃখকর হইলেও আমাদের অন্তরে এক প্রকার সুখ দান করিয়া থাকে, বিপত্তিজনক সত্যই ইহার উদাহরণ।

‡চিত্তাকর্ষক কথাটীর একটু বিস্তৃত অর্থ গ্রহণ করিতে হইবে। পাঠাভ্যাসের পর বিশ্রাম চিত্তাকর্ষক হয়। যদি কোন ব্যক্তি পাঠাভ্যাসের পর বিশ্রাম ত্যাগ করিয়া ভ্রমণ করে তাহা হইলে সে স্থলে তাহার বিবেচনামতে ভ্রমণই চিত্তাকর্ষক, বিশ্রাম নহে। যাহা আমরা বিবেচনাসঙ্গত মনে করিয়া গ্রহণ করি, তাহাকেও চিত্তাকর্ষক বলিতেছি। চিত্ত আকর্ষণ না করিলে কোন বস্তু বা বিষয় গৃহীত হয়না।—

আপনার জন্মভূমি প্রিয় একথা সত্য। কিন্তু যখন আমরা প্রবাসক্লিষ্ট হইয়া জন্মভূমির আশ্রয় গ্রহণ করি তখন তাহা কত প্রিয়! এই জন্য কবি গাহিয়াছেন—

স্নেহানাহশ্চিরপরিচিত ধ্বংসিনস্তেত্যযোগাৎ
ইষ্টৈবস্তন্যপরিচিতরসা প্রেমরাশি ভবন্তি।

• মাতার স্নেহ আনন্দদায়ী, কঠোর পৃথিবীর কঠোর তাড়নার পর মাতার বিমল স্নেহ আরও প্রিয়তর হইয়া থাকে।

সকল পুরাতনে সুখ নাই একথা বুঝাইয়া বলিতে হইবে না। কখন কখন পুরাতনের কবলে পড়িয়া আমরা সকলে সুখে জলাঞ্জলি দিতে বসি। সকল নূতনে আমরা সুখ পাই কি? না, নূতনে সুখ আছে;—দুঃখও আছে। নূতন শোক কখন সুখকর হইতে পারে কি? কখনও নহে। এস্থানে বলা আবশ্যক নূতন ও পুরাতনে সুখ দুঃখের একটু বিভিন্নতা প্রায় দৃষ্ট হইয়া থাকে। পুরাতনের সুখ দুঃখ নূতনের অপেক্ষা অধিক কাল স্থায়ী। নূতন একবার মাত্র সুখ দুঃখ দেয়। কিন্তু পুরাতন যতবার আমাদের সম্মুখে আসে,—ততবার তাহা আমাদের সুখ দুঃখ দান করে। আমি একটী নূতন বৃক্ষ দেখিলাম তাহাতে আমার কিছু সুখ হইল। কিন্তু সে সুখ অধিকদিন স্থায়ী হইল না কারণ শীঘ্রই বৃক্ষ পুরাতন হইয়া গেল। একদিন বিগত জীবনের একটী প্রভাতে আমি একটী পুষ্করিণীতটে ছোট ছোট বৃক্ষের অন্তরালে ভবিষ্যৎজীবনের এক অঙ্ক অভিনয় করিয়াছিলাম; আজ সে পুষ্করিণীতট দেখিয়া সাধ মিটে না কেন? আমি বলিতে চাহি না সকল সময়ে এই সুখ দুঃখের বিভিন্নতা দৃষ্ট হয়। পুরাতনের সুখদুঃখও অনেক সময়ে অল্পকালস্থায়ী হইয়া থাকে।

নূতন পুরাতনে পরিবর্ত্তিত হইয়া থাকে, ও ইহা সকল সময়ে ইচ্ছামত পাওয়া যায় না। ইহা মানবকে সকল সময়ে একটা স্থায়ী সুখ দিতে পারে না। এই জন্য বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমরা পুরাতনে অনুরক্ত হই। বৃদ্ধের সুখ পুরাতন হইতে গৃহীত। ঘুঘু পক্ষীর শব্দ বাল্যকালে চিত্তাকর্ষক না হইতে পারে, কিন্তু বৃদ্ধাবস্থায় ইহার শব্দ মনোরম।

যত আমরা বর্দ্ধিত হইতে থাকি, তত আমাদের পুরাতনের প্রতি একটা প্রীতি সংশ্লিষ্ট হয়। এমন এক সময় ছিল, যখন পল্লীগ্রাম আদৌ ভাল লাগিত না; কিন্তু এখন সে ভাব আর নাই। বিস্তৃত জলাভূমি শৈবলাচ্ছন্ন পুষ্করিণীতট, সবুজবর্ণ শস্য-সমূহ, কৃষকের গীতধ্বনি—যাহা এক সময়ে ভাল লাগিত না, তাহা আর এক সময়ে যেন অপূর্ব্ব নূতনশ্রী ধারণ করিয়া মনকে অজ্ঞাতে আকর্ষণ করে—বায়ুবিতাড়িত পক্ষি-কূজন-মুখরিত আম্রবন প্রাণে যেন নূতন ভাবের তরঙ্গ আনিয়া দেয়। পল্লীনিবাসী কৃষক, শান্ত-স্বভাব, তাহাদের সরলতা, প্রীতি-স্নিগ্ধ দৃষ্টি প্রতি ধমনীতে একটা আনন্দ সম্ভূত বৈদ্যুতিকপ্রবাহ সঞ্চারিত করিয়া দেয়। এই জন্যই দেশ-হিতৈষী ব্যক্তি বৃদ্ধ বয়সে সমৃদ্ধিশালী নগর ছাড়িয়া ঝিল্লী-মন্ত্র-মুখরিত ধূলিময় শৈশব-ইতিহাস-সংবদ্ধ নির্জ্জন পল্লীর

শ্মশানে আত্ম দেহদাহ আকাঙ্ক্ষা করিয়া থাকে।

কতকগুলি মানসিক নিয়ম Laws of mind) আছে যাহার অনুসারে এই পুরাতন প্রীতি চালিত হয়। মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিত-গণ এই নিয়মের সংখ্যা নির্দ্দেশ করিয়াছে। তাহাদের মতে তিনটী মাত্র নিয়ম আছে।

প্রথম—দুইটী বা ততোধিক সদৃশ বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে একটী দেখিলে অন্য এক বা ততোধিক সদৃশ বস্তুর কথা মনে পড়ে। নীল আকাশ নীলাম্বুরাশির কথা মনে করাইয়া দেয়। বন্ধুর চিত্র দেখিলে বন্ধুকে মনে পড়ে।

দ্বিতীয় নিয়মটী এই :—দুইটী বা ততো-ধিক বস্তু বা বিষয় যদি পরস্পর সংশ্লিষ্ট থাকে অর্থাৎ যদি তাহারা মিলিত হইয়া মনে স্থান পায় তাহা হইলে তন্মধ্যে একটী অন্যকে স্মরণ করাইয়া দেয়। কাশী মনে পড়িলে তত্রস্থ শিবলিঙ্গ মনে পড়ে। মেঘ দেখিলে বৃষ্টির কথা মনে পড়ে।

তৃতীয় নিয়মটী একটী ভিন্ন নিয়ম বলিয়া অনেক মনস্তত্ত্ববিৎ পণ্ডিতেরা স্থির করেন না। অনেকে বলেন দ্বিতীয় নিয়মটীও ভিন্ন নহে ইহা প্রথম নিয়মের অন্তর্গত এ সকল তর্ক সম্প্রতি আমরা স্থগিত রাখিয়া আমাদের প্রয়োজনীয় কথাগুলি* শেষ করিব তৃতীয় নিয়মটী এই :—দুইটী বিরুদ্ধ (Contrasted) বস্তু বা বিষয়ের মধ্যে একটি আর একটীর স্মৃতি আনিয়া দেয় ; সুখ দুঃখকে স্মরণ করাইয়া দেয়। পাপপুণ্যের কথা স্মৃতিপথে আনিয়া দেয়। ভোগ-বৈরাগ্য মিত্রতা-বিরোধ প্রভৃতি অন্য উদাহরণ

এই তিন নিয়মের মতে আমাদের চিন্তা চালিত হইয়া থাকে। এই তিন নিয়মের অনুসারে পুরাতন নূতনত্ব প্রাপ্ত হয়। বলি-য়াছি নূতন আমাদের চিত্তাকর্ষক। এ কথাও বলা হইয়াছে, পুরাতন যখন আমাদের চিত্তা-কর্ষক হয়, তখন তাহা নূতনত্ব প্রাপ্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। এখন পুরাতন কিরূপে নূতন হয় তাহা বিস্তৃতভাবে বলা প্রয়োজ-নীয়।

মনে কর সেই গৃহ যাহা একজনের উপস্থিতিতে উজ্জ্বল হইয়া থাকিত—যেখানে স্নেহ মায়া মমতার বিন্দু মাত্র অভাব ছিল না। মনে কর গৃহের সে উজ্জ্বলতা বিনষ্ট হইয়াছে—তোমার গৃহ বিক্রীত হইয়াছে—তুমি এখন পথের ভিখারী। মনে কর পরাধিকৃত সেই গৃহের উপর তোমার বর-প্রহিত-দৃষ্টি একবার তোমাকে অন্যমনা করিল। তুমি কি ভাবিলে? ভাবিয়া দেখ যখনি তোমার দৃষ্টি গৃহের উপর পতিত হইল, তখনি তোমার অন্তরে গৃহ সম্বন্ধীয় অন্যান্য কথা প্রতিফলিত হইল। তুমি নির্ব্বাক হইলে। তারপর তুমি কি ভাবিলে? তুমি ভাবিলে এ গৃহ এককালে আনন্দের বস্তু বা বিষয়ে পূর্ণ ছিল। সঙ্গে সঙ্গে তোমার অন্তরে আনন্দের আবির্ভাব হইল। পুরাতন

* উক্ত তিন নিয়মের মত অনুসারে ভয় প্রভৃতি অনেক মনোভাবও চালিত হইয়া থাকে। দ্রব্য অন্য দ্রব্যের স্মৃতি আনিয়া দেয় ; সেই অন্য দ্রব্য যদি কোন একটী মনোভাবের সহিত সংশ্লিষ্ট থাকে তাহা হইলে সে মনোভাবও স্মরিত হইতে থাকে।

গৃহ তোমার চিত্ত আকর্ষণ করিল। পুরাতন গৃহ নূতন একটা ভাবে সংশ্লিষ্ট হইয়া নূতনত্ব লাভ করিল।

পুরাতন একেবারে নূতন হয় না। কেবল মাত্র কতকগুলি নূতন ভাব তাহাতে সংযুক্ত হইয়া তাহাকে নূতনের মত আমাদের সন্নিকটে উপস্থিত করে। একথা পূর্ব্বে বুঝান হইয়াছে। পুনরুক্তির আবশ্যক নাই।

এখন দেখা যাইতেছে, অধিকাংশ পুরাতনে একটা অতীতের স্মৃতি সংলগ্ন থাকে যাহার দ্বারা তাহা নূতনের ন্যায় বোধ হয়। একথাও আমরা পূর্ব্বে বলিয়াছি। এখন অতীত-স্মৃতি সম্বন্ধে দুই একটী কথা বলা প্রয়োজনীয়।

অতীত স্মৃতিতে একটা জীবন্ত আকর্ষণী শক্তি বিদ্যমান আছে। এই শক্তির ফলে সুখ ও দুঃখ দুইটাই দেখিতে পাওয়া যায়। বাল্যকালের ক্রীড়াভূমিটি দেখিলে অন্তরে একটা সুখ আসে কারণ ক্রীড়াভূমি বাল্যকালের আনন্দের সহিত সংলগ্ন(Associated), সেই ক্রীড়াভূমিটি দেখিলে সেই আনন্দের স্মৃতি উদিত হয়; কিন্তু যখন আমরা ভাবি সেদিন আর আসিবে না, সে আনন্দ আর আমাদের লাভ হইবে না তখন মনে একটা দুঃখের রেখাও ফুটিয়া উঠে। কবি যখন গাহিল,

There rainbow comes and goes
And lovely is the rose
The moon doth with delight
Look round her when the heavens
are bare.
Flowers in a starry night
Are beautiful and fair,
The sunshine is a glorious birth,
Yet I feel turn wheresoever I may
That there has passed away a
glory from the earth.

তখন তাহার অন্তরে সুখ দুঃখ যুগপৎ আবির্ভূত হইল। এখন বুঝিতে হইবে এই সুখ দুঃখের মধ্যে প্রাধান্য কাহার।

অন্তর্জগতের কার্য্যকলাপ বড় সুন্দর বড় মনোরম। প্রকৃতির কার্য্য কৌশল মনুষ্য-চিত্তে যেমন স্পষ্ট লক্ষিত হয় তেমন আর বুঝি কোথাও হয় না। একটি চিন্তা কিরূপে আর একটি চিন্তার সূত্র ধারণ করে একটি সামান্য মনোভাব কিরূপে অন্য মনোভাবের সহিত মিলিত হয় তাহা বুঝিতে পারিলে বাস্তবিক একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দ উপস্থিত হয়। আমরা সুখপ্রয়াসী সত্য, কিন্তু সে সুখ কখন কখন দুঃখ হইতেও উৎপন্ন হয়। আনন্দের চিত্র মানবকে মুগ্ধ করে। দুঃখ কি কখন আনন্দ-দায়ক হয় না? রঙ্গমঞ্চে হাসি তামাসায় আনন্দ হয়; কিন্তু যখন আমরা অকাল-মৃত্যু, গভীর দুঃখ, অসহ্য বিরহ প্রভৃতি অভিনীত হইতে দেখি, তখনও কি আমরা একটা নীরব আনন্দ উপভোগ করি না। রঙ্গমঞ্চে "রাজারাণীর" অভিনয় দেখিয়া একটা দুঃখ অনুভব করি বটে, কিন্তু সে দুঃখ কি সুখের কারণ নহে? "রাজারাণী" বিয়োগান্তগভীর দুঃখপূর্ণ নাটক বলিয়া ইহা আমাদিগকে সুখ দান করে। বাস্তবিক আমরা দুঃখেও সময়ে সময়ে

একটা আনন্দের প্রতিবিম্ব দেখিতে পাই। বয়স একটু অধিক হইলেই হাসি তামাসা অপেক্ষা দুঃখের কাহিনী, মিলন অপেক্ষা বিচ্ছেদের কাহিনী, ভাল লাগে হাসির গান আমাদিগকে আনন্দ দান করে সত্য, কিন্তু খেদসূচক গানে যেমন একটা স্থায়ী শান্তি পাওয়া যায়,তেমন আর কোথাও দৃষ্ট হয় না। এই জন্য কবি গাহিয়াছেন

Our sweetest songs are those that
tell of saddest thoughts,

যে পুরাতন স্মরণ করিলে মনে যুগপৎ সুখদুঃখের আবির্ভাব হয়, তাহা মানবের আদরের সামগ্রী, কারণ সে পুরাতনে সুখের প্রাধান্য অধিক ও দুঃখের অংশ টুকু সুখ হইতে অভিন্ন। বাল্যস্মৃতিসংলগ্ন কোন বস্তু দেখিয়া আমাদের চিত্ত যখন স্থিরনিশ্চল হয় তখন বুঝিতে হইবে চিত্তে আনন্দ বিদ্যমান, দুঃখ নহে। দুঃখের সময় মাঝে মাঝে বায়ুস্পর্শে,ঝঞ্ঝাবাতে,জলদগর্জনে,যে অনিমিত্ত স্মৃতি তড়িৎ প্রবাহের ন্যায় মস্তিষ্কের ভিতর দিয়া ছুটিয়া যায়, তাহার ফল দুঃখ নহে, বরং সুখ। সন্তপ্তচিত্ত শীতল করিয়া,যখন নিশীথবায়ু মৃদুহিল্লোলে শান্তিমগ্না প্রকৃতির তরুকুন্তললগ্ন পুষ্পহার কম্পিত করিয়া বহিয়া যায় তখন আর একটা রজনী মনে পড়ে। সে রজনীর সুখস্মৃতিগুলি উদ্দাম বায়ুর মত মনোমাঝে ছুটিয়া আসিয়া যেন কি একটা অভাব জানাইয়া দেয় সে অভাব মানবের অন্তরে দুঃখসিক্ত একটা সুখ দান করে, তাহা দুঃখ-প্রধান নহে। খাপাপহতচিত্ত দুষ্যন্ত অন্তঃপুরনিসৃত মধুর সঙ্গীত শুনিয়া যখন মালিনীতটবর্ত্তী অতিমুক্ত লতাগৃহে যে সময় অতিবাহিত হইয়াছে তাহা স্মরণ করিতে পারিল না যখন সেই বিগত সময় ও তৎসংলগ্ন সুখস্মৃতি অজ্ঞাত ভাবে, অপ্রকাশিত থাকিয়া অন্তরের একটী নিভৃত তন্ত্রীতে অতিমৃদু আঘাত করিল যখন ভ্রান্ত দুষ্যন্তের মুখ হইতে গভীর চিন্তা সহযোগে উচ্চারিত হইল—

রম্যাণি বীক্ষ্য মধুরাংশ্চ নিশম্য শব্দান
পর্য্যুৎসুকী ভবতি যৎসুখিতোঽপি জন্তুঃ
তচ্চেতসা স্মরতি নূনমবোধপূর্ব্বং
ভাবস্থিরাণি জননান্তরসৌহৃদানি॥

তখন তাহার অন্তরে অভাবজনিত দুঃখের মধ্যেও সুখের প্রাধান্য ছিল। বিয়োগান্ত নাটকের উপসংহারেও যে আনন্দ অনুভূত হয় সেই প্রকার কোন একটা আনন্দ তাহার অন্তরে ক্ষরিত হইতেছিল। এ আনন্দের প্রকৃতি নির্ণয় করা সুকঠিন ইহা দুঃখ হইতে উদ্ভূত। করুন সঙ্গীতেও ইহার অস্তিত্ব স্পষ্ট অনুভূত হয়। করুন রাগিনীসম্ভূত দূরশ্রুত সঙ্গীতে নয়নে অশ্রু প্রবাহিত হয়, কিন্তু সে অশ্রুপ্রবাহে আনন্দ আছে তাহা না হইলে সুখপ্রয়াসী * আমরা কাঁদিতে যাইব কেন?

কিন্তু উক্ত যুগপৎ আবির্ভূত সুখ-দুঃখের মধ্যে কখন কখন দুঃখেরও প্রাধান্য দেখা যায়। দুঃখের সময়ে সুখস্মৃতি আনন্দ দান করে এ কথা বলিয়াছি। যে স্থলে অতীত

* সুখ কথাটীর অর্থ এখানে বিস্তৃত। যে দুঃখ আমাদিগের চিত্ত আকর্ষণ করে তাহাকেও সুখ বলা হইল। যাহা আমাদের বাঞ্ছিত তাহা সুখের কারণ বলিয়া এস্থলে গৃহীত হইয়াছে।

সুখলাভের আশা আছে, অথবা অতীত সুখের অভাব সুজাত দুঃখ নূতন ও অতি তীব্র, তখন সে আনন্দে দুঃখের স্থায় প্রতীয়মান হয়; পুত্র-শোকাতুরা জননীর অন্তরে যখন মৃত-পুত্রের কার্য্যকলাপ একটি একটি করিয়া উঁকি মারিয়া যায় তখন পূর্ব্বোক্ত দুঃখ সম্ভূত আনন্দ দুঃখে পরিণত হইয়া থাকে। সীতা বিরহ-দগ্ধ হতাশহৃদয় রামচন্দ্রকে বাসন্তীদেবী যখন বলিলেন :—

অস্মিন্নেব লতাগৃহে ত্বমভবস্তন্মার্গদত্তেক্ষণঃ।
সা হংসৈঃ কৃতকৌতুকা চিরমভূদ্গোদাবরী
সৈকতে
আয়ান্ত্যাঃ পরিদুর্ম্মনায়িতমিব ত্বাং বীক্ষ্য
বদ্ধ স্তয়া।
কাতর্য্যাদরবিন্দকুট্মলনিভো মুগ্ধঃ
প্রণামাঞ্জলিঃ।

যখন শোককাতর রামচন্দ্রের অন্তরে বর্ণিত সীতাপ্রতিকৃতি চিত্রিত হইল, তখন তাঁহার দুঃখ প্রাধান্য লাভ করিল। বাস্তবিক অতীত স্মৃতি চিত্তাকর্ষক অতএব সুখকর। কখন কখন কেবলমাত্র ইহার সুখ দুঃখে পরিণত হইয়া থাকে।

পুরাতন দুই প্রকারে মানবকে মুগ্ধ করে। অতীতের স্মৃতির সহিত সংলগ্ন হইয়া ইহা মানবের অন্তরে একটা অভিনব সুখের স্রোত প্রবাহিত করিয়া দেয়। পুরাতনে সুখের আস্বাদ পাইয়া মানব পুরাতনে মনপ্রাণ সঁপিয়া পুরাতনের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া যায়। এই পুরাতনপ্রীতি ক্রমে নূতনেও পতিত হয়। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানগুলি আমার নিকট নূতন, কিন্তু তাহারা পুরাকালের সাক্ষী, সেইজন্য পুরাতনে যে প্রীতি, তাহাদিগের উপরও সেই প্রীতি বিদ্যমান। কুরুক্ষেত্র, আমার নিকট নূতন; কিন্তু কেন তাহার পানে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলে পুরাতন প্রীতিতে মনপ্রাণ ভরিয়া যায়? স্মৃতি বায়ু হিল্লোলে বহুকালবিস্মৃত কথাগুলি একটী একটী করিয়া অনন্ত অতীতরূপ অন্ধকূপ হইতে উত্থিত হইয়া প্রাণ মুগ্ধ করিয়া দেয়? কোথা আমি; কোথা সে কাল যাহা আমার জীবনের কত পূর্ব্বে কাটিয়া গিয়াছে। তথাপি কেন মনে পড়ে সেই প্রাচীন ইতিবৃত্ত কথা, সেই অদ্বিতীয় বীরগণের চরিত্র। মনে কর সহসা তুমি পথে যাইতে যাইতে একটী ধ্বংসপ্রায় অট্টালিকা দেখিতে পাইল। তোমার নিকট ইহা নূতন, তথাপি তুমি ইহাতে পুরাতনের সৌন্দর্য্য দেখিতেছ। তোমার মনে হয়, হয়ত এই অট্টালিকা এককালে একটী বৃহৎ পরিবারের বসতি ছিল; হয়ত তাহাদের দোর্দ্দণ্ড প্রতাপে এককালে এই স্থান যাহা তুমি জঙ্গলা বৃত দেখিতেছ, তাহা অমরাবতীর স্থায় শোভা পাইত। বালকবালিকাগণের কলরবে গৃহাঙ্গনাদিগের উচ্চহাস্যে হয়ত এই দিগ্ব্যাপিনী নিস্তব্ধতা এককালে অরণ্য-গর্ভে আশ্রয় গ্রহণ করিত। সম্মুখে বিশাল ম্রিয়মান কণ্টকসমাকীর্ণ দীর্ঘিকা, এখন তাহা ভগ্নাবশিষ্ট, তথাপি তুমি মনে করি কি হে কবি, যে এককালে ইহার বর্ত্তমান দশা বিদ্যমান ছিল? চিন্তা কর, হে জ্ঞান বৃদ্ধ তোমার অন্তরে এখন কি ভাব বিরাজ করিতেছে। তুমি এই দীর্ঘিকা দেখিয়া

দুঃখিত হইয়াছ বোধ হইতে পারে, কিন্তু তুমি বুঝিবে এ দুঃখ ত্যাগ করিতে ইচ্ছা যায় না; ইহা এক প্রকার সুখ।

এই পুরাতনপ্রীতি যত বর্দ্ধিত হয়, তত আমরা নূতন ছাড়িয়া পুরাতনে আকৃষ্ট হই। কারণ পুরাতনে সুখ বর্ত্তমান। আমরা সুখ প্রয়াসী; যত আমরা জীবনপথে অগ্রসর হইতে থাকি, তত দেখিতে পাই, অতীতে সুখও বর্ত্তমানে দুঃখ। বর্ত্তমানে সুখ আমরা ভাল করিয়া বুঝিতে পারি না। যখন তাহা অতীত সমুদ্রে ঝাপ দেয় তখন বুঝিতে পারি তাহাতে কতটা সুখের মাত্রা বিদ্যমান ছিল। সুখের সময় তুমি অশেষ আনন্দে কাল কাটাইতেছ। হে ভোগী। তোমার ভোগের অবসান নাই; কিন্তু তুমি বুঝিতে পার না তুমি কতটা সুখভোগ করিতেছ। কিন্তু কিছুকাল পরে দেখিও যে সুখ তুমি ভোগ করিতেছ তাহা কত অধিক। বাল্যকালের সুখ বাল্যকালে বুঝ নাই এখন তুমি তাহার প্রকৃত সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিতে পার।

এইরূপে এককালে পুরাতনের উপর আমাদের একটা মায়া বা ভালবাসা পড়িয়া যায়। তখন নূতন ভাল লাগে না। এই জন্য অন্য কারণ বিদ্যমান না থাকিলে আধুনিক সমাজ ছাড়িয়া আমরা পুরাতন সমাজে বাস করিতে ইচ্ছা করি। নূতন আচার, নূতন ব্যবহার ছাড়িয়া আবার পুরাতন আচার ব্যবহার গ্রহণ করিতে ইচ্ছা যায়। এ সময়ের কুটিলতাপূর্ণ, স্বার্থপর জগৎ দেখিয়া মনে করি আবার সেই ধর্ম্মময় স্বার্থহীন জগৎ ফিরিয়া আসুক। তখন মনে হয়, পুরাতন-সকলই ভাল, নূতন মন্দ। তখন ইচ্ছা হয় আবার সেই চিত্র যাহা আমরা পুরাতন গ্রামে দেখিয়াছি, সেই অমৌখিকী সরলতা, ধারাবাহী স্নেহ, মনোহারিণী মমতা, নগরে নগরে, গৃহে গৃহে লক্ষিত হউক; কখন মনে হয়, সেই প্রাচীন কাল, যে সময়ে ভারতবর্ষ আর এক মূর্ত্তিতে শোভা পাইত, যে সময়ে বিদ্যা ও লক্ষ্মীর জীবন্ত প্রতিমা প্রতিষ্ঠিত ছিল, যে সময়ে ভারতভূমিনিহিতা। একটি নেত্র ঘাতিনী প্রভা দিঙ্মণ্ডল আলোকিত করিয়াছিল সে সময় আবার ফিরিয়া আসুক, আবার ভারতে ব্যাস, বাল্মিকী, গর্গ, পতঞ্জলি স্বস্ব মহিমা বিকীর্ণ করিয়া বিরাজ করুক, আবার নৈমিষারণ্যে প্রভাতসমীরণ ঋষিকণ্ঠোত্থিত সামগান বহন করিয়া মৃদুমন্দহিল্লোলে বহিয়া যাক, আবার হিমাদ্রি হইতে কুমারী অন্তরীপ পর্য্যন্ত কালিদাস ভবভূতি প্রভৃতির কবিত্ব-ঝঙ্কারে মুখরিত হোক।

পুরাতনে কেবলমাত্র যে অতীত-স্মৃতি সংলগ্ন হইয়া তাহাকে চিত্তাকর্ষক করিয়া তুলে তাহা নহে; বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের কল্পনাও একটু একটু করিয়া তাহাতে সংলগ্ন হয়। মেঘগর্জ্জন একটা সামান্য প্রাকৃতিক ঘটনামাত্র; ইহা চিত্তাকর্ষক না হইতে পারে; কিন্তু যখন আমরা কল্পনা করি মেঘগর্জ্জন সুরাসুরের যুদ্ধ সূচনা করিতেছে, তখন তাহা নূতন হইয়া আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করে। এই কল্পনা যত বর্দ্ধিত হয় তত পুরাতন একটা আনন্দ ও শান্তির আধার হইতে থাকে। কবির কৃতিত্ব এই

উঁহারা পুরাতনকে নূতন করিয়া থাকে। তাহার অলঙ্কার এইরূপ। বসন্ত আবির্ভূত হইল একথাটি তত মনোরঞ্জন করিতে পারে না কিন্তু যদি বলা যায়—

কুবেরগুপ্তাং দিশমুষ্ণরশ্মৌ
গন্তুং প্রবৃত্তে সময়ং বিলঙ্ঘ্য।
দিগ্দক্ষিণা গন্ধবহং মুখেন
ব্যলীকনিশ্বাসমিবোৎসসর্জ।

তাহা হইলে একটা নূতনত্ব আমাদের নয়ন সম্মুখে একটা নূতন চিত্র ধারণ করে, এইজন্য কবি সামান্য বস্তু দ্বারা আমাদিগকে মুগ্ধ করে। কল্পনা সুন্দর—তাহার সৌন্দর্য্যে সকল বস্তু সুন্দর হইয়া থাকে। কবির উপমা আমাদিগের নিকট ভিন্ন একটা বস্তু আনিয়া আমাদিগকে মোহিত করে। হরিৎ-শস্যক্ষেত্র যখন প্রকৃতিদেবীর লীলাভূমি বলিয়া বোধ হয়, তখন তাহা পূর্ব্বাপেক্ষা সুন্দর বন-বিহঙ্গ গান করে, বিন্ধ্যহিমাচল মস্তক উন্নত করিয়া অবস্থান করে, কিন্তু যখন তাহাদিগকে দেখিয়া আমরা বলিতে পারি—

কৈলাস সুমেরু বিন্ধ্য হিমাচল,
গ্রীবা উচ্চ করি কি হেরিছ বল
করেছ কি হেরে নয়ন সফল,
বিশ্বম্ভর বিশ্বেশ্বরে।

তখন পর্ব্বতে সুনীল-গগনে একটা নূতন সৌন্দর্য্য ফুটিয়া উঠে। প্রাকৃতিক শোভা মনোরম। কি যখন প্রকৃতির সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হইয়া তাহার প্রতি ভঙ্গীতে চিন্তারত হইয়া, তন্মধ্যে অনুভব করিতে পারি—

A motion a spirit that impels
All thinking things
all objects of all sorts
And rolls through all things

তাহা হইলে প্রকৃতিকে আর একচক্ষে দেখিয়া তন্ময় হইতে পারা যায়। নূতন সদাসর্ব্বদা আমাদের নয়নপথে পতিত হয় না। অতএব পুরাতন লইয়া যদি জীবন কাটাইতে হয় তাহা হইলে কল্পনা ও স্মৃতি পুরাতনের সহিত সংযোজিত করিতে হইবে। কাব্যেরও ইহা উদ্দেশ্য।

শ্রীসুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি, এ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য।

আমরা "আলোচনা" এজেন্সী নাম দিয়া পুস্তকের কারবার খুলিয়াছি তাহার জন্য স্বতন্ত্র পুস্তকের বিজ্ঞাপন স্থানান্তরে দেওয়া হইল। আমরা সকল প্রকার নাটক, নভেল স্কুলপাঠ্য পুস্তক এবং অন্যান্য আবশ্যকীয় দ্রব্যাদি মফঃস্বলে ভিঃ পিতে পাঠাইয়া থাকি। অপরিচিত স্থলে ১০৲ টাকার অধিক দ্রব্যের জিনিস হইলে সিকি টাকা অগ্রিম লইয়া থাকি।

ডিঃ ডিঃ শর্ম্মা এণ্ড সন্স।

ভক্তি ও শক্তি।

শক্তি ঘুমাযে রয, ভক্তি জাগায় তারে।
ভক্তির বাতাস বয় শক্তির পারাবারে॥
সাধনার পাষাণ ভেদিয়া,
ফুটিযা উঠিছে যবে ভক্তির নিঝর,
শত লক্ষ বাহু বাড়াইয়া
আহ্বান করিছে তায শক্তিব সাগর।
অবিরাম শক্তি ঘুরে ভক্তিব সহিত
নতশিরে, যোড়করে, অনাদরে উপেক্ষিত।
ভয় আছে, স্বার্থ আছে, বাহুবল তার কাছে
পরাজিত হয়,
ভকতি আসিয়া সবে, পরাজিয়া সগৌরবে
হৃদিমঝে দাঁড়াইয়া রয।
তাঁহারই বিদ্যুত ইঙ্গিতে,
নাচিছে অশনি,
মৃত্যুরে নে যায আলিঙ্গিতে
খেলা মনে গণি'।
দেবতার দীপশিখা উঠিলে জ্বলিযা,
ফরিঙের সম তার আপনা ভুলিয়া,
কেবলি সে দিতে পারে আত্ম-বিসর্জ্জন।
যাতনা বেদনা তারে, কাতর করিতে নারে
ছিঁড়ে হৃদি আপনার, বাঁধে সে বীণাব তার
শুধু ইষ্ট দেবতার গাহিতে ভজন।
শুধুই পূজার তরে, সে কেবল বাঁচে মরে,
মন্দিরের ধুপ দীপ মত,
জীয়ন্তে আলোক দানে, সুধাগন্ধ নিরবানে
আপনারে নিয়োজে সতত।
হৃদয়ের পাতাল গুহায়
রহিয়াছে সে বাসুকী,
ফণা পরে ধরেছে ধরায
গুরুভারে নতমুখী।
মৃদুল কম্পনে ওব
বিশ্ব শক্তি উঠে কেঁপে,
প্রলয় সংহাব ঘোব
দিকে দিক উঠে ব্যেপে।
অষ্টাদশ অক্ষৌহিনী বাহিনী লইয়া,
কুরুক্ষেত্রে আসিছে শকতি ;
ভকতি আসিছে তা'রে নিমিষে জিনিয়া
শুধু পঙ্কজনে তার করিয়া সারথি।
আয় তবে ভক্তি আয, হৃদয়ের ঠাঁই,
তোর হাতখানি ধরি,
সাধনা সোপানোপরি,
উঠি আমি ধীরে ধীরে যার কাছে যাই
প্রতীক্ষায় সেকি মোর আছেন দাঁড়াই ?

শ্রীধীরেন্দ্র লাল চৌধুরী।

পরিবর্ত্তনের যুগ।

প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয় ভূখণ্ডে যে একটা পরিবর্ত্তনের যুগের আবির্ভাব হইয়াছে, ইহা সামান্য অনুধাবনেই স্পষ্ট প্রতীত হয়। পরিবর্ত্তন বাদীরা জড় জীব এবং নৈতিক এই ত্রিবিধ জগতেই একটা মাত্র নিয়মের কার্য্যকারিতা শক্তির উপলব্ধি করিয়া থাকেন। সেই নিয়মের বশবর্ত্তী হইয়াই এই বিশ্ব-সংসারের তাবৎ বস্তুই একটা দুর্জ্ঞেয় লক্ষ্যের অভিমুখে ক্রমশঃ অগ্রসর হইতেছে। আজ যে এসিয়া-ইউরোপ আফ্রিকার নবজাগরণ তাহাও কি সেই নিয়মের অভিব্যক্তি নহে?

বক্তব্যটা আর একটু পরিষ্কারভাবে বুঝা যাউক। যখন দেখিতেছি, মিশরবাসিগণ আজ তাহাদের দেশের শাসন এবং রাজস্ব ব্যাপারে আপনাদের ক্ষমতা প্রসারের জন্য প্রাণ-পণে চেষ্টা করিতেছে, যখন দেখিতেছি, তুরস্কের সুলতান নব্য তুরস্কের সনির্ব্বন্ধ প্রার্থনায় তাঁহারা কঠোর এবং যথেচ্ছা-ব্যবহৃত শাসনদণ্ড সংযত করিয়া প্রজাশক্তির অভিমত শাসনপ্রণালীর ব্যবস্থা করিয়াছেন, যখন দেখিতেছি, পারস্যের সাহ বিপ্লবের হস্ত হইতে রাজ্যরক্ষার মানসে প্রথমে প্রজাবৃন্দের আন্দোলনের নিকট পরাভব স্বীকার করিলেন এবং পরে সহসা স্বীয় মত পরিবর্ত্তনের জন্য অশেষবিধ লাঞ্ছনা ভোগ করিলেন, যখন দেখিতেছি নিদ্রিত ভারতের বিশাল দেহও স্বাতন্ত্র্য লাভের জন্য শক্তি-স্পন্দন দেখা গিয়াছে, যখন দেখিতেছি যথেচ্ছাচারের আদর্শ লীলাক্ষেত্র রুষেও প্রজাতন্ত্র স্থাপনের জন্য শোণিতময় উদ্যোগ—তখন কি মনে এরূপ প্রশ্নের উদয় হয় না যে এই রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনের অর্থ কি? দেখা যাইতেছে—পৃথীবীর সকল দেশই এক সমস্যার সমাধানে নিযুক্ত। শ্যামরাজও এই পরিবর্ত্তনের বহির্ভূত নহে। চীনেরও অহিফেনের নেশার ঘোর কাটিয়াছে—(অনেকে মনে করেন সভ্যজগৎ দ্বাদশ বৎসর কাল মধ্যে চিনের জাতীয় মহাসভা ([illegible]) দেখিবে চীন আজ যাবতীয় শাসনপ্রণালীর পর্য্যবেক্ষণের জন্য ইউরোপে অভিজ্ঞ রাজনৈতিক প্রেরণ করিয়াছেন।—এমন কি ফিলিপীবাসীরাও আজ মহা আড়ম্বরে স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থা করিতেছে।—জাপানেরতো কথাই নাই—জাপান আজ সভ্য জগতে উচ্চাসন পাইয়াছে—তাহার বিধি ব্যবস্থা—শাসন-প্রণালী সভ্য জগতেরও অনুকরণের বিষয় হইয়াছে।

সতঃই মনে হয় এই অদ্ভুত রাজ-নৈতিক ঘটনার অর্থ কি? এই পরিবর্ত্তনের অনুগামী দেশ সকল কোন এক জাগতিক নিয়মের অধীন? না ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইয়া মহাধ্বংসের অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে?

ইউরোপীয় রাজ-শক্তি প্রাচ্যের সকল দেশেই প্রভাব বিস্তার করিয়াছে। ইহার প্রতিকূলে দণ্ডায়মান হইয়া আত্মরক্ষা করা আর বালুকা-রাশি-সাহায্যে খরস্রোতা নদীর গতিরোধ করা উভয়ই সমান। এরূপ

কৃষ্ণ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতে হইলে, আপন আপন অস্তিত্ব, রক্ষা করিতে হইলে পাশ্চাত্য-রাজ-শক্তির শাসন-যন্ত্রের পার্শ্বে একটু স্থানলাভ ভিন্ন উপায়ান্তর নাই,—শাসন-যন্ত্র পরিচালন-কার্য্যে মাত্র যদি ইউরোপীয় রাজ-শক্তির প্রভুত্ব থাকে—তবে প্রাচ্য প্রজা-শক্তিকে শাসন-চক্রের নিষ্পেষণে চূর্ণ বিচূর্ণ হইতে হইবে। স্বাতন্ত্র্য এবং অস্তিত্ব রক্ষার ইহাই বর্ত্তমান অবস্থায় উপযোগী উপায় ভাবিয়া স্বায়ত্ত-শাসন-লাভের জন্ম প্রাচ্যের এইরূপ ব্যাকুলতা।

কিন্তু ভারতের উপর এই পরিবর্ত্তন-যুগের প্রভাবের একটু বিশেষত্ব বিশিষ্ট। এই বিরাট আন্দোলনের মূলে, মুষ্টিমেয় ব্যবহার-জীবী ও মসীজীবীর ক্ষণিক উত্তেজনা, না কোন এক ঐশী-শক্তির প্রচ্ছন্ন প্রভাব? এ প্রশ্ন অনেকের মনে উদিত হয়। তবে ইহা সত্য যে, ব্যবহারজীবী, উন্মার্গগামী ছাত্র অথবা কেরানীর উত্তেজনা প্রসূত হইলে এ আন্দোলন জলবিম্বের ন্যায় বহু পূর্ব্বেই কাল-সাগরে বিলীন হইয়া যাইত।—এই আন্দোলন সূক্ষ্মদর্শীর চক্ষে, বহুদিন যাবৎ অন্তর্নিহিত কোন শক্তির ক্রম-বিকাশ এবং ক্রম-বিস্তৃতি-লাভের ফলে হইয়াছে।—এখন ইহা এইরূপ পুষ্টাবয়ব হইয়াছে যে কঠোর রাজ-শক্তির দ্বারা দমন চেষ্টার কাল অতিক্রম করিয়াছে। ইহার মূল এতদূর দৃঢ়বদ্ধ ও প্রচ্ছন্ন যে তাহার উচ্ছেদ-চেষ্টা সম্পূর্ণ বিফল।—ভারত ধর্ম্ম-প্রধান দেশ,—যাহা ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে, তাহা এদেশের জলবায়ুতে তিষ্ঠিতে পারিবে না। কিন্তু বর্ত্তমান আন্দোলনের স্রোত ধর্ম্মের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে প্রবাহিত হইতেছে।—সেই জন্যই "স্বধর্ম্মের" উপর স্বদেশীর প্রতিষ্ঠা-প্রয়াস। বৈদিক যুগের সেই অনাবিল ধর্ম্ম—ব্রাহ্মণের উজ্জ্বল আদর্শের দিকে সকল সম্প্রদায়ের দৃষ্টি পড়িয়াছে। জাতীয়তা এবং ধর্ম্মপ্রাণতার একত্র সমবায়ে আমাদের এই রাজ-নৈতিক অভিযান পবিত্র-ভাব ধারণ করিয়াছে—বঙ্গদেশে ব্রাহ্ম-সমাজের এবং উত্তর পশ্চিম-প্রদেশের আর্য্য সমাজের আন্দোলন কি আমাদের জাতীয় আন্দোলনের অন্তর্ভুক্ত বলা যায় না? জলন্ত আত্মত্যাগের আদর্শ ৺রামকৃষ্ণ সেবক সম্প্রদায়ের দেশ-হিতৈষণা কি আমাদের স্বদেশী আন্দোলনের অপর একদিক নহে? ৺স্বামী বিবেকানন্দের মহান আত্মা এখনও অনেককে উদ্বুদ্ধ করিতেছে। আর যাঁহারা যথার্থ ভারতের মঙ্গলকামী তাঁহারা যে সমাজ-সংস্কারের দিকে মনোনিবেশ করিয়াছেন—তাহাও কি স্বদেশী আন্দোলন স্রোতের অপর এক শাখা নহে? তাই বলিতেছিলাম আমাদের এই নব জাগরণ কতকগুলা নিষ্কর্ম্মা ব্যবহারজীবীর এবং ভাবপ্রবণ যুবকের চীৎকারের ফলে নহে। এ জাগরণের কার্য্য-কারণে কোন এক মহান্ শক্তিধরের হস্ত দেখা যাইতেছে। হিন্দু এখন তাহার ভবিষ্যৎ স্বাতন্ত্র্যের আদর্শকে ধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত দেখে। স্বরাজের বৈদিক ব্যাখ্যাই তাহারা গ্রহণের প্রয়াসী। তাহারা বলে "বেদ উপনিষদ স্মৃতি আত্মার স্বাধীনতার জন্য উপদেশ দিতেছে। পরা

ধীনতা আত্মার দৈন্য এ কথা বেদের উক্তি। ধর্ম্মের আদেশ, ঈশ্বরের অভিপ্রায় কতদিন উপেক্ষিত থাকিবে?" মুক্তিই আমাদের মতে Sumnum bonum. চরম লক্ষ্য। উদ্দেশ্য আধ্যাত্মিক উন্নতি তবে যে আজ কাল এই আন্দোলনের সঙ্গে সঙ্গে কতকগুলি আদর্শ বহির্ভূত অপ্রীতিকর অশান্তির সূচনা হইতেছে—তাহা যথার্থ আন্দোলনের অঙ্গীভূত নহে। অম্বুবিম্বের ন্যায় অচিরেই বিলয় পাইবে। ভারতের আন্দোলনের উদ্দেশ্য স্বতন্ত্র, প্রণালী স্বতন্ত্র, লক্ষ্য স্বতন্ত্র। আত্ম-প্রাধান্য লাভ, আত্ম-প্রতিষ্ঠা, জগতের সম্মুখে মহান্ আদর্শের প্রতিষ্ঠা, ভারতের অভ্যুদয় আর "কাহিনী" বা "স্বপন" নহে। নবযুগের উষার আলোকে পূর্ব্বাশার রক্তিমরাগে রঞ্জিত হইতেছে; কোকিলকণ্ঠে "বন্দে-মাতরম্ সঙ্গীতে মায়ের কোটি সন্তান আহ্বান-গান করিতেছে; অরুণোদয়ের বিলম্ব নাই। তাই কবির সহিত গাহিতে ইচ্ছা হয়—

"দাও করতালি, জয় জয় বলি,
ভরিয়ে অঞ্জলি কুসুমসহ;
অই যে প্রাচীতে, হাসিতে হাসিতে,
উদয় অরুণ উষাসহ।

শ্রীপঞ্চানন ভট্টাচার্য্য বি, এ।

বিফল জীবন।

সদাব্যস্ত জীবনের বাহ্য আড়ম্বর,
করে হায় মানবের প্রজ্ঞা-নেত্র-হীন,
ভ্রান্তিবশে তাই চিত্তে, ভাবে নিরন্তর
সেধেছি জীবন-ব্রত, মোরা নিশি দিন;
মিথ্যা সাফল্যের এক মানসী-প্রতিমা
ব্যর্থ-তৃপ্তি হরষেতে, গড়ি কতমতে,
হৃদিপুরে করে পূজা, অসার গরিমা
দগ্ধ-জীবনের চিত্র না দেয় হেরিতে।

জীবন-সায়াহ্নে যবে, নিস্তব্ধ মন্দিরে
বেজেউঠে অতঃপর মৃত্যু-শঙ্খ-নাদ;
অলিক-স্বপন ঘুচি, জ্ঞান আসে ফিরে
মর্ম্মন্তুদ শোক আর বহিয়া বিষাদ।
তখন উজ্জ্বলরূপে, করে দরশন
সবামিথ্যা—শূন্যময—বিফল জীবন।

শ্রীভূপতি চরণ চক্রবর্ত্তী।

—০—

প্রেমের সাধনা।

(গাথা)

(১)

চাকমা রাজের বীর বালা
করিলেক পণ—
'ওই উচ্চ পাহাড় হতে
যে পড়িয়া নদীর স্রোতে
পাইবে জীবন,
তারে দিব বরমালা
তারে দিব ধন।'

(২)

দেশ-বিদেশে গেল খবর
এল কত বীর
প্রেমের তরে জীবন দিতে
সাহস নিজ প্রকাশিতে
সবাই অধীর।
রাজ্যভরি উঠে লহর
উৎসাহে গভীর।

(৩)

একদিন সে গিরি চূড়ায়
হোল মহা-মেলা
সাধক যত একে একে
পড়িল উচ্চ পাহাড় থেকে
প্রাণে করি হেলা
সবাই গেল ভেসে কোথায়
স্রোতে যেন ভেলা।

(৪)

বিশালিতম জনসঙ্ঘে
উঠে হাহাকার—
কহিছে স্বরে এ উহায়
কিবা ভীষণ পণরে হায়
রাজ বালিকার,
এতটা দেহ এক সঙ্গে
হল ছারখার।

(৫)

রাজার সুতা দাঁড়ায়ে রহে—
মুখে নাহি বাণী—
ফুলের মালা দুলিছে কণ্ঠে
উথলে যৌবন দেহ ছন্দে
কত সুখে জানি।
হিয়ার সৌরভ বায়ু বহে
মোহি ধরাখানি।

(৬)

আকুল চোকে চাহি বারেক
ওই মুখপানে—
চতুর এক ছত্র খুলি
লম্ফ দিল কুতুহলি
নদীর বিতানে।
হাজার দৃষ্টি অনিমেখ
তাহারি ধেয়ানে।

(৭)

নদীর বুকে নামিল সে
মৃদু বায়ুভরে—
গগন কাঁপে হরষ রোলে
রাজার বালা দিলেন গলে
মালা সমাদরে।

---

* এই গাথাটী জনশ্রুতি অবলোকনে লিখিত। "জামাইমারা" পাহাড় এখনও পরিলক্ষিত হইয়া পার্বত্য চট্টগ্রামান্তর্গত রাঙ্গামাটী যাতায়াত পথে থাকে। লেখক।

সবাই ফিরে আপন ঘরে
শুভাশীস্ করে।

(৮)

না জানি এ কবের কথা
কে কহিবে হায়—
"জামাইমারা" পাহাড় ঘেরে
...বিরাজ করে
নদী কিনারায়।
জাগেগো কত ব্যাকুলতা
আজো দেখে তায়।

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত বি এ।

—০—

এক থালা প্রসাদ।

কোন দুর স্বর্গ হতে অকস্মাৎ কোন্ পথে
নেমে এল মুক্ত সুধাধার
ভক্ত ছিল তপস্যায়, ত্রস্তে সে চমকি চায়
এত প্রেম এত স্নেহ কার!
কোন্ মহা শুভক্ষণে নন্দনে বাজিল বাঁশি
উথলিল বিহঙ্গ কাকলি
লয়ে ক্ষুদ্র ফুলডালি দিল দেখা সুপ্রভাত
বিশ্ব মোর পুলকে উজলি।
শুনেছি ত্রিস্রোতা গঙ্গা আজি কিন্তু চারিধারা
ডাল শাক ডালনা, অম্বল
কারে স্পর্শ করি আগে জুড়াই অন্তর জ্বালা
একান্ত যে হয়েছি বিহ্বল!
একি কোন যজ্ঞ হতে উঠিয়াছে পুণ্য চরু
অন্নপূর্ণা কর-পৃষ্ঠ-একি
এত স্নিগ্ধ স্বাদ মর্ত্ত্যে না জানি সম্ভবে কিনা
মুক্তি মোর নাহি বুঝি বাকি!

ওইযে সুবর্ণনিভ পবিত্র মুগের ডাল
নারিকেল পূর্ণ শাক অই
ওইযে মধুর অম্ল নারী হৃদয়েরি মত
ডালনা তুলনা হায় কই।
অতি গুপ্ত মরমের প্রতি বিন্দু যত্ন লয়ে
প্রতি বিন্দু স্নেহ প্রীতি দানি'
প্রস্তুত যা হইয়াছে, যার প্রতি কনা সঙ্গে
লুকাইয়া আছে প্রাণখানি—
অভাগা অক্ষম কবি, দুর্ব্বল লেখনী অতি
কেমনে করিবে স্তুতি তার—
শুধু বহে স্তব্ধ হয়ে সুবিপুল ভাবোচ্ছ্বাসে
হারাইয়ে সত্তা আপনার।
চতুর্ব্বর্গ ফল লাভে আজি যে কৃতার্থ কবি,
কি করিবে তোমা আশীর্ব্বাদ
মাগে শুধু জন্মে জন্মে পায় যেন এই মত
দীনভক্ত শ্রীহস্ত-প্রসাদ।

শ্রীযামিনী জীবন দত্ত রায়।

"স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত।"

(পূর্ব্ব প্রকাশিতের পর।)

স্বর্গীয় মহারাজা সূর্য্যকান্ত; ময়মনসিংহের জন্য কি না করিয়াছেন! ময়মনসিংহের জন সাধারণ কত সুখ সুবিধা ভোগ করিতেছেন তাহা মহারাজ সূর্য্যকান্তের করুণার ফল বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। ময়মনসিংহের সর্ব্বপ্রকার সাধারণ কার্য্যে

তিনি সর্ব্ব বিষয়ে জড়িত ছিলেন, বঙ্গ বিভাগের পর হইতে কেবল স্বদেশের কার্য্যে এবং স্বদেশের চিন্তায় ব্যাকুল ছিলেন মহারাজ সূর্য্যকান্ত বঙ্গ-বিভাগ এবং স্বদেশী আন্দোলনের মেরুদণ্ড ছিলেন, স্বয়ং লর্ড-কর্জ্জন ভয় বিভিষিকা প্রদর্শন করিয়াও তাঁহাকে সঙ্কল্প চ্যুত করিতে সমর্থও হন নাই। আজ কয়েক বৎসর যাবৎ সমগ্র বঙ্গদেশ তাঁহার কার্য্য-ক্ষেত্র হইয়াছিল, বঙ্গলক্ষ্মী কটন্‌মিল প্রভৃতি বড় ২ স্বদেশী অনুষ্ঠানের তিনি এক জন প্রধান ছিলেন,মহারাজ সূর্য্য-কান্তের ন্যায় স্বদেশ বৎসল গুণবান মাতৃভক্ত সন্তান আবার কবে সেই শূন্যস্থান পূর্ণ করিবেন।

এযুগে যাহা কীর্ত্তি-স্মৃতির পরিচায়ক মহারাজ সূর্য্যকান্ত সেই সাধনায় আয় মন-প্রাণ সমর্পিত করিয়াছিলেন, বঙ্গ ব্যব-চ্ছেদের বিষময় ফল উপলব্ধি করিয়াই তো মহারাজ তেজোগর্ব্বের সহিত তাহাকে তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, মহারাজ সূর্য্যকান্তের কথায় আরও কত কথাই মনে উদয় হয় তাহা লিখিলে প্রবন্ধ-বিস্তার হইয়া পড়ে, সুতরাং সংক্ষেপেই তাঁহার কার্য্য সম্বন্ধে কয়েকটি কথা লিখিতে অগ্রসর হইলাম। মনে পড়ে মহারাজ প্রায় লক্ষাধিক টাকা ব্যয়ে ময়মনসিংহে জলের কল্ নির্ম্মাণ করিয়া দিয়া ময়মনসিংহ সহরবাসীর নিদারুণ জল-কষ্ট দূরীভূত করিয়াছেন, মনে হয় বার্ষিক বিশ হাজার টাকা আয়ের সম্পত্তি অবহেলায় সহিত দান করিয়া "ন্যাশন্যাল্ কলেজ স্থাপনে ব্রতী হইয়াছিলেন।"

মহারাজ সূর্য্যকান্ত সাধারণতঃ ময়মনসিংহের, মহারাজ-নামে পরিচিত ছিলেন, ময়মনসিংহ জিলার অন্তঃর্গত মুক্তাগাছার আচার্য্য চৌধুরী বংশের নাম কেনা অবগত আছেন? মহারাজ সূর্য্যকান্ত অনেক দিন হইতেই আচার্য্য-চৌধুরীবংশের প্রধান পুরুষমধ্যে গণ্য ছিলেন, মুক্তাগাছার আচার্য্য চৌধুরীগণ বারেন্দ্রশ্রেণীর গণ্য ব্রাহ্মণ, বারেন্দ্র-কুল-গৌরব উদয়নাচার্য্য ভাদুরী হইতে মুক্তা-গাছার আচার্য্য-চৌধুরী-বংশের প্রতিষ্ঠা হয়। কুসুমাঞ্জলী-প্রণেতা উদয়নাচার্য্য, যেরূপে বৌদ্ধাচার্য্যগণকে বিচারে পরাভূত করেন সে সমাচার ইতিহাস-পাঠকমাত্রেই অবগত আছেন, মহারাজ সূর্য্যকান্ত সেই বংশেরই বংশধর বলিয়া প্রসিদ্ধ ছিলেন। মহারাজের আদিপুরুষ শ্রীকৃষ্ণ আচার্য্য চৌধুরী মূর্শিদাবাদের তাৎকালিক নবাব বাহাদুরের নিকট হইতে আপন কৃতকার্য্যের পুরস্কার-স্বরূপ "আলাপসিংহ" পরগণার স্বত্ব-স্বামিত্ব লাভ করিয়াছিলেন, ইহা আজ প্রায় ২০০ শত বৎসরের পূর্ব্ব ঘটনা। যাহা হউক নবাব প্রদত্ত সেই আলাপসিংহ পর-গনাই পরবর্ত্তীকালে মুক্তাগাছার ভূম্যধী-কারীগণের জমীদারী বলিয়া পরিগণিত হয়। মহারাজ সূর্য্যকান্ত সেই জমিদারীর অধি-কাংশের স্বত্বভোগী ছিলেন, অধিকন্তু জমি-দারী ক্রমশঃ নানারূপে বৃদ্ধি পাইয়াছিল।

মহারাজের পঞ্চদশ বর্ষ বয়সের সময় মাতৃ-বিয়োগের পর, তাঁহার সমুদয় সম্পত্তি "কোর্ট অব ওয়ার্ডসের" অধীনে ন্যস্ত হয়। শিক্ষার জন্য মহারাজ কলিকাতায় "ওয়ার্ডস্ ইনষ্টিটিউসনে" প্রেরিত হন। এই

সময়ে ময়মনসিংহ ভিন্ন বগুড়া মালদহ, মুর্শিদাবাদ, এবং পাটনা জেলায় মহারাজের বহু জমিদারী ছিল, এবং সর্ব্ব সমেত প্রায় ৩ তিন লক্ষ একর অর্থাৎ প্রায় ১০ দশ লক্ষ বিঘা জমি গবর্ণমেণ্ট "কোর্ট অব ওয়ার্ডসে ভুক্ত করিয়া লইয়াছিলেন। ১৮৬৭ খৃষ্টাব্দে বয়ঃপ্রাপ্ত হইয়া মহারাজা বাহাদুর তাঁহার বিপুল সম্পত্তির স্বত্যাধিকারী হন। মহারাজের সুব্যবস্থায় সে সম্পত্তি এক্ষণে অনেক পরিমাণ বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং পূর্ব্বাপেক্ষা তাহার আয়ও যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে। ১৮৭৭ খৃষ্টাব্দে দিল্লীর দরবারে মহারাণী ভিক্টোরিয়া, যখন "সম্রাজ্ঞী" বলিয়া কীর্ত্তিত হন, মহারাজা সূর্য্যকান্ত সেই সময় গবর্ণমেণ্টের নিকট "রায় বাহাদুর" উপাধী পাইয়াছিলেন। উহার দশ বৎসর পরে, তাৎকালীক ছোটলাট স্যার এসলিইডেন্ বাহাদুরের সুপারিশ অনুসারে মহারাজ সূর্য্যকান্ত "রাজা" উপাধী লাভ করেন। অতঃপর ১৮৮৭ খৃষ্টাব্দে সূর্য্যকান্ত, "মহারাজ" উপাধীতে ভূষিত হন, সদানুষ্ঠানে মুক্তহস্ত এবং গবর্ণমেণ্টের প্রতি অনুরক্ত ছিলেন বলিয়াই মহারাজ বাহাদুর গবর্ণমেণ্টের নিকট ঐরূপ উপাধী-সম্মান পাইয়াছিলেন।

জয়েণ্ট মাজিষ্টর ফিলিপের কীর্ত্তি কাহিনীর সময় মহারাজের প্রতি দেশের জনসাধারণের প্রথম দৃষ্টি আকর্ষিত হয়। উদ্ধত যুবক মাজিষ্টর ফিলিপ মিউনিশিপালিটি ঘটিত একটা তুচ্ছ মোকর্দ্দমায় মহারাজ বাহাদুরকে আসামী শ্রেণীতে ভুক্ত করিয়া, তাঁহাকে কাঠগড়ায় দাঁড় করাইয়াছিলেন বলিয়া কিলাতে ভারতে তুমুল আন্দোলন উপস্থিত হয়, সেই আন্দোলনে তাৎকালিক ছোটলাটের আসন বিচলিত হইয়াছিল, এবং গবর্ণমেণ্ট বিশেষ ক্ষুব্ধভাব প্রকাশ করিয়াছিলেন। এমন কি সেই উপলক্ষে মাজিষ্ট্রর ফিলিপকে শেষে মহারাজ সূর্য্যকান্তের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে হইয়াছিল। ফিলিপের ব্যাপারে মহারাজা যেরূপ দৃঢ়তা ও সাহসের পরিচয় দিয়াছিলেন, তাহাতে মহারাজের যশঃখ্যাতি বহুদূর বিস্তৃত হইয়া পড়িয়াছিল। সর্ব্বাপেক্ষা মহারাজের দৃঢতা ও সাহসের পরিচয় পাওয়া যায়। যখন বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ ব্যাপারে মাজিষ্টর হইতে কমিশনর, ছোটলাট হইতে বড়লাট কর্জ্জন বাহাদুর, উচ্চ রাজকর্ম্মচারীগণ প্রায় সকলেই, বঙ্গচ্ছেদ ব্যাপাবে তাঁহাকে সম্মতি দানে অনুরোধ করিয়াছিলেন, কিন্তু সূর্য্যকান্ত অটল অচল,বঙ্গচ্ছেদ ব্যাপার তিনি দেশের অনিষ্টকর বলিয়া মনে করিয়াছিলেন। এবং সেই জন্য কোন মতেই কাহারও অনুরোধে আপন বিরুদ্ধমতপ্রকাশে তিনি সম্মত হন নাই। মহারাজের যশঃসম্মানে তাঁহার বিজয় বৈজয়ন্তী মৃত্যুর পূর্ব্বদিন পর্য্যন্ত স্বদেশী সাধনায় মহারাজ প্রাণ পূর্ণ করিয়াছিলেন। এই সকল নানা কারণে মহারাজ অনেক সাহেবগণের বিরাগভাজন হইতে বসিয়াছিলেন কিন্তু তৎ স্বত্যেও তিনি স্বদেশী সাধনায় অনুরাগী ছিলেন।

শিক্ষার দোষে, প্রথম জীবনে মহারাজ বাহাদুর সাহেবীয়ানায় বড়ই অনুরক্ত ছিলেন, যুবা বয়সে সাহেবগণের প্রমোদনের জন্য

প্রায়ই তিনি নাচ, ভোজ দিতেন, এবং শিকার প্রভৃতিতে ব্যাপৃত থাকিতেন, মহারাজ শিকারী বলিয়া বিশেষ প্রসিদ্ধ ছিলেন। কোনও কোনও বৎসরে প্রায় ২।৩ দুই তিন লক্ষ টাকা শিকার ব্যাপারে ব্যয় হইত। যৌবনের প্রারম্ভেই মহারাজের পত্নী বিয়োগ হয়। তাহার পর মহারাজ বাহাদুর আর দ্বারপরিগ্রহ করেন নাই। মহারাজ অপুত্রক ছিলেন। আপন ভ্রাতা মুক্তাগাছার অন্যতম জমিদার সুপ্রসিদ্ধ দানশীল শ্রীযুক্ত জগৎ কিশোর আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত শশীকান্ত আচার্য্য-চৌধুরী মহাশয়কে তিনি পালকপুত্র রূপে গ্রহণ করেন মহারাজ কুমার শ্রীযুক্ত শশীকান্ত আচার্য্য চৌধুরী মহাশয়ই এক্ষণে মহারাজ সূর্য্যকান্তের একমাত্র উত্তরাধিকারী। মহারাজ-কুমার ইংলণ্ডে 'ক্যাম্‌ব্রিজ' বিশ্ববিদ্যালয়ে বিদ্যা শিক্ষার জন্য অবস্থিতি করিতেছেন। ব্যারিষ্টার শ্রীযুক্ত ব্যোমকেশ চক্রবর্ত্তি মহাশয়ের কন্যার সহিত মহারাজ কুমারের পরিণয় কার্য্য পূর্ব্বেই সমারোহের সহিত সম্পন্ন হইয়াছে। ঐ পরিণয় ব্যাপারে এবং মহারাজ কুমারকে বিলাত প্রেরণ প্রভৃতি হেতু ইদানিং স্ব-সমাজে মহারাজ বাহাদুরের প্রতিপত্তি কথঞ্চিৎ কমিয়া আসিয়াছিল। এই ব্যাপারে তাঁহার ন্যায় সদ্বংশ সম্ভূত ব্রাহ্মণের ব্রহ্মণ্যে আঘাত লাগিয়াছে; ইহারই জন্যই আমাদের দুঃখ, নহিলে বঙ্গচ্ছেদ ব্যাপারে, স্বদেশী সাধনায় এবং বিবিধ প্রকারের দেশ-হিতৈষণার কার্য্যে মহারাজ সর্ব্বত্রই প্রতিষ্ঠাপন্ন ছিলেন। মহারাজের প্রতিষ্ঠার অন্যতম নিদর্শন, মহারাজ বঙ্গ ভাষার সেবা করিতেন, তিনি "শিকারকাহিনী" নামক মনোহর গ্রন্থ রচনা করিয়া গিয়াছেন, এবং "নির্ম্মাল্য" নামক মাসিক-পত্রিকা সম্পাদনে ও নানা প্রকারে প্রবন্ধ ও সঙ্গীত রচনায় তিনি কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন। মহারাজের সকল কার্য্যই প্রশংসনীয়। তাঁহার গুণাবলীর মধ্যে তাঁহার সাহিত্যসেবাই প্রধানতঃ তাঁহার স্মৃতি চির জাগরুক্ করিয়া রাখিবে।

পূর্ব্ববঙ্গের সূর্য্য আজি অস্তমিত হল।
　　না পোহাতে সুখ উষা
　　ফুরাইল সব আশা
স্বদেশীর সেনাপতি জীবন ত্যজিল।
ভারতের সূর্য্য আজি অস্তমিত হ'ল।
বঙ্গের প্রখর সূর্য্য হল অবসান,
　　এখন রজনী শেষে
　　উষা সতী মৃদুহাসে।
"বিপিনে" কোকিল পাখী ধরিল সুতান
এমনি সময়ে সূর্য্য হল অবসান
না হইতে সুপ্রভাত সূর্য্যঅস্তে যান।
　　কেবল কুসুমকলি
　　ফুটন্ত ঐ ফুলগুলি
মৃদুল সমীরে সুখে ঢেলে দেছে প্রাণ
এ হেন সময়ে সূর্য্য হল তিরোধান।
বঙ্গসূর্য্য অস্ত গেল, অসময়ে হায়।
　　আকুল মধুপগণ
　　মধুস্বরে করে গান;
করে যবে মধুপান নেচে ফুল গায়
সূর্য্যকান্ত অস্তগেল হেন অসময়।

কুসুমিত হয়েছিল যত তরু শাখা
ওই দেখ নিলিমায়
সুধু ভেসেছিল হায়
কাল বিভাবরি শেষে ক্ষীণ স্বর্ণ রেখা,
শাখী শীরে পাখীকুল দিয়েছিল দেখা।
সঞ্চারিয়া পক্ষদ্বয় নেচেছিল ময়ুরিণী
তর তর সর সরে
সুমধুর ধ্বনি করে
আনন্দে প্রফুল্ল হয়ে ছিল তরঙ্গিনী
চঞ্চল হিল্লোলে সুখে ছিল কমলিনী।
কিঞ্চিৎ আলোক রেখা দেখি নভ বুকে
বঙ্গ বাসী জেগে ছিল
মা বলিয়া ডেকে ছিল
হেনকালে "সূর্য্যকান্ত বঙ্গ হৃদি থেকে
পড়িল খসিয়া হায় কৃতান্তের মুখে।
না ঘুচিতে স্বদেশের দুঃখ দুর্নিবার
অস্ত গেল দিনমণি
আইল আধার যামী
পুবব রঙ্গের রত্ন হল তিরোহিত
কাল-চোরে চুরি করি করিল বিব্রত।

শ্রীবিপিনচন্দ্র চৌধুরী।

প্রভাত।

ছিল ধরা যবে সুপ্তি-মগ্ন
নিশার কোলে :
ছিল না যখন তোমার মন্দিরে
আপন ভুলে,
লইয়া কুসম তুলে
রচিয়া অর্ঘ্য ফুলে
পূজারি শত, পূজিতে তোমায
লহর তুলে ;
তখন তোমায় পেয়েছি ত নাথ
হৃদয় মূলে।
যখন তোমার আকাশ মাঝারে
অযুত তারা
চেয়ে চারিদিক উদাস তরাসে
প্রদানি' সাড়া
হইত আপন হারা
তখন তোমায় ছাড়া
দেখিনি কিছুই বিশ্ব মাঝারে
প্রেমের পারা,
তখন কিছুই পাইনি ত নাথ
তোমায় ছাড়া।
যখন তোমার সাগরের বুকে
লহর গুলি
লুটাত তোমার চরণের তলে
উঠিত ফুলি'
উর্ম্মির কোলাকুলি—
পলকের ভোলাভুলি
হৃদয়ে আমার দিয়াছে জাগায়ে
আপনা ভুলি'—
তুমি আছ নাথ, অশ্রু মুছাই'য়ে
লইতে তুলি'।
যখন ঘুর্ণিত তোমার ধরায়,
আঁধার রাশি,
যখন তোমার কানন মাঝারে
দিতনা হাসি',
গোলাপ চামেলী যুঁথি
মাধবী করবা জাতি,
তোমার প্রভাত, স্নিগ্ধ উষা
নিবিড় আঁধার নাশি',
তখনি তোমার উঠেছে হৃদয়ে
মূর্ত্তি ভাসি'।

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ বিশ্বাস।

আপদ ।

জগতের আঁখিগুলি যদি না চহিত ফিরে,
আঁধারে আলোকে মিশে যাইতাম ধীরে ধীরে !
যাহাতে মানস ধায়, সে যেথা মিলে গো হায়,
সেথায় যাইতে পদ বাধ বাধ করে ফিরে ?—
জগতের আঁখিগুলি যদি না চাহিত ফিরে !

পাষাণে গঠিত এ কঠিন হিয়া,
গলেনাক তাপে যায় বিদরিয়া !
আমার পাষাণ-হৃদি বিদরিছে নিরবধি,
পাশব প্রকৃতিগণে বিষাণ বিধায়,
যাতনায় ধড়ফড় করি হায়, হায় ।

জগতের আঁখিগুলি বড়ই আপদ !
অই চাহনির ভয়ে, বিবশ অধীর হয়ে,
আঁটু ভেঙ্গে পড়ি হায়, চলিতে দু'পদ,
জগতের আঁখিগুলি বড়ই আপদ ।

জটিল সংসারে দেখি কেবলি বিপদ !
কপটতা বাসেভিয়া, সাবধানে আবরিয়া,
ধীরে ধীরে অতি ভয়ে ফেলিতেছি পদ,
জটিল সংসারে দেখি কেবলি বিপদ ।

বাঁধিয়া বিদীর্ণ হৃদি কাটাব ক'দিন ?
কতদিন এই ভবে, এ যাতনা সহা যাবে ?
আশায় বাঁধিয়া বুক, ভেবে ভেবে ক্ষীণ,—
বাঁধিয়া বিদীর্ণ হৃদি কাটাব কদিন ?

এস হে বাঞ্ছিত, এস এস, এইখানে বোস
হৃদি সিংহাসন খানি যতনে রেখেছি পেতে,
আঁধারে লুকায়ে এস, আমি যে পারিনে যেতে,
তব কৃপা বিনা, বাসনা মিটেনা,
ঘুচেনা ঘুচেনা হৃদয় বেদনা,

এস ভাঙ্গা বুকে, ছাও কলিজা, ধমনী,
বিতর অমৃত স্পর্শ—মৃত সঞ্জীবনী!
পিয়াও গো সুধা, নিবার' এ ক্ষুধা,
নিবার' পিপাসা, সুজলে, জলদা,
তুমি শক্তি রূপা দেবি, অশক্ত এ দীন,
এ জগৎ যন্ত্র যত তোমার অধীন।

তোমার ইচ্ছায় হয় সমুদায়,
তাই এ সাধনা, সাধি গো তোমায়!

এ'স গো হৃদয় মাঝে রাখ' রাঙ্গাপদ,
তোমার কৃপায় দেবি, ঘুচুক আপদ।

শ্রীতারিণীচরণ মুখোপাধ্যায়।

জাতীয়-গৌরব নষ্ট।

স্বভাবতঃ একজন মনুষ্য বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ় ও বার্দ্ধক্যের পর যেমন মৃত্যু নামক অবস্থা প্রাপ্ত হইয়া পুনঃ নবজন্ম গ্রহণ করে, সেইরূপ সমস্ত জাতীয় জীবনও এইরূপ অবস্থাত্রয় অতিক্রম করিয়া বার্দ্ধক্যের শেষে পুনরায় তমোগুণে ভূষিত হইয়া পুনর্জন্ম গ্রহণ করে। ভারতের আর্য্যগণও উক্তরূপ অবস্থা-চতুষ্টয় উত্তীর্ণ হইয়া, অধুনা আবার তমোগুণে বিভূষিত হইয়া এই বিশাল তামসরাজ্যে নবজন্ম গ্রহণ করিয়াছে। এই আর্য্যগণ পূর্ব্বজন্মে শৈশবের ব্রহ্মচর্য্যে প্রতিষ্ঠিত বিপুল শিক্ষা-দীক্ষা ও সংযম নীতি; যৌবন সময়ের অতুল বলবীর্য্য পূর্ণ-বীরত্ব; প্রৌঢের শরদিন্দুসদৃশ নির্ম্মল জ্ঞান-বিজড়িত ধর্ম্ম; বৃদ্ধাবস্থার সোঽহং বাদ যাহা কোন সময় এই ভারতের, শুধু ভারতের নয়, সমস্ত জগতের শিরোভূষণ হইয়া, সর্ব্বত্র রবি-কিরণের ন্যায় বিরাজিত ছিল; তাহাই এক্ষণে কালের কুটীলগতিতে ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতম হইয়া হৃদয়ে স্মৃতিরূপে কিঞ্চিৎ জাগরুক রহিয়াছে মাত্র।

এই বিশাল জগতের আর্য্য ব্রাহ্মণ সন্তানগণই যে উক্ত গুণে বিভূষিত ছিল, এবং নানাবিধ সৎকার্য্যানুষ্ঠান, তপস্যা, যাগ যজ্ঞ সমুদয় যে ইহাদের দ্বারা অনুষ্ঠিত হইত ইহা বলাই বাহুল্য। ইঁহারাই যে সমাজের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া সমগ্র ভারতে প্রাধান্য লাভ করিয়াছিলেন—ইহা আমাদের এখন কেবলমাত্র কথাতেই পর্য্যবসিত হইয়াছে। তাঁহারা যদি কিছু অসৎ কার্য্যের অনুষ্ঠান করিতেন, তাহা হইলে ধর্ম্ম ভীরু প্রাচীন ব্রাহ্মণগণ তদপেক্ষা গুরুতর সদনুষ্ঠান দ্বারা

তাহার প্রায়শ্চিত্ত বিধান করিয়া, নিষ্পাপ হইতেন, ধর্ম্মপথ সর্ব্বদাই নিকণ্টক রাখিতেন, এবং অন্য আর্য্য সন্তানগণকে সতত সদুপদেশ, অধ্যাপনা প্রভৃতি দ্বারা সন্মার্গাবলম্বন করাইতেন তাহারাও যথারীতি সৎপথ অনুসরণ পূর্ব্বক ব্রাহ্মণদিগকে যথেষ্ট পরিমাণে সম্মান করিত এবং ভয় ও ভক্তি করিত। কিন্তু পরিবর্ত্তনশীল এই বিস্তৃত জগতে চিরকাল একভাবে সদসৎ কোন কার্য্যই চলে না ; সংসারের পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী, অতএব ইহাতে কাহারও প্রতি দোষারোপ করা যায় না। কারণ সংসারের জীবগণ জাগতিক নিয়মকে অতিক্রম করিতে কখনই সমর্থ নয়। সংসারের, মনুষ্য সকল, বাল্য, যৌবন, প্রৌঢ়, বৃদ্ধ, অবস্থার শেষে অর্থাৎ সত্ত-রজো-গুণ হইতে অতীত হইয়া এখনতমোগুণে সমাচ্ছন্ন থাকিয়া নবজন্ম গ্রহণ করিয়া ঠিক তামসিক ভাবে সকল কার্য্য করিতেছে এবং ব্রাহ্মণগণ দ্বারা যাহা সদনুষ্ঠান যাগ, যজ্ঞ, পূজা, মন্ত্র, ধর্ম্মকার্য্য অনুষ্ঠিত হইতেছে তাহা প্রায়ই উক্ত গুণে ভূষিত হইয়া তামসিকভাবে অর্থাৎ অতি নিকৃষ্ট নিয়মে চলিতেছে বলিয়া তাহারা উহার সম্যক্ ফল লাভ করিতে পারিতেছে না ; তবে কি বাস্তবিক সত্তগুণাশ্রিত ব্রাহ্মণ এই বিশাল ভারতে আর মাত্রও নাই? তাহা নহে অবশ্যই সাত্তিক লোক বহু থাকিলেও অধিকাংশ লোকই তমোগুণে সমাচ্ছন্ন। সেই কারণে আমাদের এই দুরাবস্থা হইয়াছে। যাহারা সাত্বিক লোক আছেন—তাহারাই পুনঃ সংসারের পরিবর্ত্তন ঘটাইবেন ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস কারণ জগৎ পরিবর্ত্তনশীল ইহার পরিবর্ত্তন অবশ্যই সম্পাদিত হইবে।

তবে আমাদের একান্ত কর্ত্তব্য যাহাতে পুনর্ব্বার হৃদয়ে সত্বগুণ অধিক পরিমাণে আশ্রয় পায়, সেইরূপ কার্য্য আমাদের সত্বর করা উচিত. আমরা সমাজগত বহুদিন ব্যাপী উৎকট পাপে লিপ্ত থাকা বশতঃ বহু পাপ সঞ্চয় করিয়াছি, সেই পাপক্ষয় করিতে হইবে. অতি কঠিন প্রায়শ্চিত্ত দ্বারা উক্তপাপ ক্ষয়করিতে পারিলে, শীঘ্রই পুনরায় আমরা ভারতের শীর্ষ স্থান লাভ করিতে সমর্থ হইব। বহুদিন গত হইল প্রায় প্রাচীন কাল হইতে ব্রাহ্মণেরা অভিমানে আত্মগৌরবে অধৈর্য্য হইয়া, বহুবিধ কুকর্ম্ম করিয়া জাতীয় গৌরব একেবারে নষ্ট করিয়া ফেলিয়াছে।

(প্রারব্ধকর্ম্মানাং ভোগাদেবক্ষয়ঃ)

পূর্ব্বকৃত কর্ম্মের ভোগ না হইলে ক্ষয় হয় না, আমাদের অদৃষ্টেও অনেক ভোগ আছে,এই কর্ম্ম ভোগ শেষ হইলেই অচিরাৎ আমরা ভারতের উচ্চস্তরে আরোহন করিতে সমর্থ হইব। জাতীয় নষ্টভূত গৌরবকে পুনরুদ্ধার করিতে হইলে সেই রূপ কঠোর প্রায়শ্চিত্তকরিতে হইবে।

যত দিন না ভারতের পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়া প্রাচীন গৌরব,প্রাচীন ধর্ম্মভাব পুনরানয়ন করে, তত দিন উন্নতি উন্নতি বলিয়া চীৎকার করা, বক্তৃতার দ্বারা গগন-তল ভেদ করা হস্তী স্নানের ন্যায় বৃথা হইবে।

যতদিন প্রাচীন কালের ন্যায় ধর্ম্মের ভিত্তিতে সমস্ত গঠিত না হয় ততদিন একতা একতা বলিয়া চীৎকার করা কেবল হিন্দু মুসলমান সকলের একত্রে পরিণত ব্যতীত আর কিছুই দেখিতে পাই না.

শ্রীরাইচরণ ভট্টাচার্য্য।

পরামর্শ বিষয়ক প্রস্তাব।

আমরা কোন কার্য্য সঙ্কল্প করিয়া যখন তাহাতে ব্রতী হই, তখন যদি কেহ আমাদের সঙ্কল্পিত পদ্ধতি অনুসারে কার্য্য সাধনের পরামর্শ দেয়, তাহা হইলে সেই পরামর্শ অনেক সময় আমাদিগকে উৎসাহ ও স্ফূর্ত্তি প্রদান করিয়া থাকে, আর যদি কেহ আমাদের মন-রচিত সঙ্কল্পের বিরুদ্ধে পরামর্শ দেয়, তাহা হইলে উহা সারবান হইলেও চিত্তে স্থায়ীভাবে ক্রিয়া করিতে চাহে না, ইহার কারণ নির্দ্দেশ করাও কঠিন নহে। মনুষ্যমণ্ডলী তাহাদের প্রকৃতিজ গুণাশ্রিত হইয়া কর্ম্মপথে বিচরণ করিতেছে, তাহার প্রকৃতির বিরুদ্ধ ধর্ম্মের কথা বলিলে, হয়ত তাহা তাহার মননসৃষ্ট আদর্শের তুলনায় খাট হইয়া পড়ে, অথবা উহার সম্পাদন যুক্তিকর প্রতীতি হইলেও পরামর্শ গ্রহণকারীর ধারণা বা শক্তির আয়ত্তাধীন মনে না হওয়ায় ঐ পরামর্শটি ফলোপদায়ক হয় না। পরামর্শ দাতা গুরুস্থানীয়, পরামর্শের প্রভাবে মানব মন উন্নত ও অবনত অবস্থায় প্রতিষ্ঠিত হইয়া থাকে, যে পরামর্শে মানব-হৃদয় উন্নতাবস্থায় অধিষ্ঠিত করায়, সেই পরামর্শ সর্ব্বদাই প্রার্থনীয় কিন্তু পরামর্শের ক্রমাতিশয্যের দিকে পরামর্শ দাতার তীক্ষ্ণ দৃষ্টি নিবদ্ধ করিতে হইবে। যাহারা এজগতে প্রলোভনের মোহে পড়িয়া অথবা কুপরামর্শ দাতার বাক্য পালন করিয়া জীবনের সমস্ত সুখশান্তি বিসর্জ্জন দিয়াছেন, তাহারা যদি কোন সময় আমাদের নিকট তাহাদের জীবনের দুঃখকাহিনী করুণভাবে প্রকাশ করেন, তাহা হইলে উহা শ্রবণ করিয়াও উহার উৎপত্তির কারণ বিদিত হইয়া আমরা প্রভূত শিক্ষা পাইতে পারি। অতএব যাহারা ভ্রমসাগরের ভীষণ আবর্ত্তনের মধ্যে নিপতিত হইয়া উত্তীর্ণ হইয়াছেন, তাহারা পরামর্শচ্ছলে যে উপদেশ প্রদান করেন, তাহাও নিতান্ত হিতকর বলিয়া প্রমাণীত হইয়া থাকে।

কাহাকেও বিনা প্রয়োজনে, অথবা যেটুকু প্রয়োজন, তাহার অধিক পরামর্শচ্ছলে বলা সঙ্গত নহে। অনেকে অসাধারণ পাণ্ডিত্য জ্ঞাপনের জন্য প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা বলিয়া যশস্বী হইতে চেষ্টা করিয়া থাকেন, বিনা প্রয়োজনে যে কথা বলা হয়, তাহা অসাধারণ পণ্ডিত-মুখনিসৃত হইলেও মনোযোগ আকর্ষণ করিতে পারে না। কাজেই পণ্ডিতের পাণ্ডিত্যপূর্ণ সে পরামর্শ মূর্খ ব্যক্তির অবিদ্যা-বিজৃম্ভিত বাক্যাবলীর অপেক্ষা অধিকতর মূল্যবান বিবেচিত হয় না। আমরা অনেক সময় পূর্ব্ব প্রকারের পণ্ডিতগণের নিকট ২।১ টা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করিয়া যে সব প্রয়োজনাতিরিক্ত কথা শুনিতে পাইয়া থাকি, তাহা আমাদের চিত্ত আকর্ষণ করা দূরে থাকুক, কর্ণপটহ দগ্ধ করিয়া থাকে। পরামর্শ প্রদানের সময় বিজ্ঞতার দিকে দৃষ্টি না রাখিয়া পরের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে চেষ্টা করিও, এবং তাহার হৃদয় নিহিত গুপ্তবাসনা বিশ্লেষণ-

করিয়া তাহার প্রকৃত অব তাহার নয়নের সম্মুখে ধারণ করিয়া পরামর্শ প্রদান করিও, তাহা হইলে প্রস্তাবিত পরামর্শের সে গুরুত্ব ধারণা করিতে পারিয়া নিতান্ত প্রফুল্লিত হইবে। যে গুণে পাণ্ডিত্য লাভ করা যায়, কেবল সেই গুণ উদ্ভাসিত করিয়া যদি তুমি পরের হৃদয় কবাট উন্মুক্ত করিতে চেষ্টা পাও,তাহা হইলে নিশ্চয়ই প্রতারিত হইবে। পরের হৃদয়-মন্দিরে প্রবেশ করিযা তাহার শোভা পরিদর্শন করার জন্য কোন্ গুণের আশ্রয় লাভ করা চাই?—সহানুভাবকতার। যিনি শাস্ত্রবেত্তা তিনিই সহানুভাবক নহেন। যিনি শাস্ত্রবিদ্ ও মহানুভাবক তিনিই শ্রেষ্ঠ পরামর্শদাতা।

যদি কোন ব্যক্তি একটা জটিল বিষয় বুঝিবার নিমিত্ত কিছু জিজ্ঞাসা করেন, তাহা হইলে উত্তর দাতা তৎসম্বন্ধে যতদুর ধারণা করিতে সমর্থ, তদ্বিষয় বিন্দু মাত্র গোপন না করিয়া নিষ্কপট ভাবে প্রশ্ন কারীকে বুঝাইয়া দিবেন। এরূপ চেষ্টার ফল শুভদায়ক। প্রথমতঃ এই রূপ চেষ্টায় জিজ্ঞাসু ব্যক্তির হৃদয় খানি বেশ আকৃষ্ট হইবে, হয়তঃ তাহার প্রতি যথোচিত সরলতা প্রদর্শন করা হইবে। সহায়তার ভাণ করিয়া পরামর্শ চাওয়া অত্যন্ত ঘনাক্কর। যেমন উহা দ্বারা মনের প্রকৃত অবস্থা গোপন করিয়া বাহিরে সাধুতার ভান দেখাইতে হয়, তেমনি পরামর্শ দাতার নিকট হইতে কতকগুলি কথা বাহির করিয়া তাহাকে তাচ্ছল্য প্রকাশ করা হয়। কোন কোন লোক অভীষ্ট কার্য্য সাধনের পথ আবিষ্কার করিয়া তাহা সমর্থনের জন্য তৃতীয় ব্যক্তির নিকট একটা পরামর্শ জিজ্ঞাসা করেন, যদি তাহার সঙ্গে পরামর্শ দাতার মতের ঐক্য হয়, তাহা হইলে তাহাকে দলভুক্ত করিয়া, সংকল্পিত কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন, নতুবা লোক হইতে লোকান্তর গমন করিয়া, যতক্ষণ আপন মতের সমর্থনকারী লোক না পান, ততক্ষণ প্রসন্ন চিত্তে কার্য্যারম্ভ করেন না। এরূপ প্রকৃতির লোক কুটিল অহঙ্কারী ও পরদোষদর্শী।

তুমি কোন লোককে যখন পরামর্শ প্রদান করিবে, তখন দেখিবে সেই পরামর্শটির মধ্যে তোমার কোন স্বার্থ নিহিত আছে কিনা? যদি থাকে তাহা হইলে তদ্বিষয় সরল ও পরিষ্কার রূপে পরামর্শ-গ্রহণ-কারীকে বুঝাইয়া বলিবে।

যদি তোমার স্বার্থের কথাটি গোপন করিয়া কোন মত প্রকাশ কর, তাহা হইলে যিনি তোমার নিকট পরামর্শ যাচ্না করিতে আসিয়াছেন, তিনি যখন তোমার স্বার্থের কথাটি জানিতে পাইবেন, তখন আপন মঙ্গল ও অমঙ্গলের দিকে না তাকাইয়া তিনি তোমার পরামর্শটি অগ্রাহ্য করিবেন। যাহারা পরামর্শ দাতার আসনে মধ্যে মধ্যে উপবিষ্ট হইয়া থাকেন, তাহাদের এই উল্লিখিত বাক্যটি সর্ব্বদা যেন স্মৃতিপথে উদিত থাকে।

উদার ভাবে যদি কোন গভীর তত্ত্ব হৃদয়ঙ্গম করিতে চাও, তাহা হইলে যাহার মেজাজ অবস্থা, ও ধারণার সঙ্গে তোমার সৌসাদৃশ্য নাই তাহার সহিত পরামর্শ করিবে। এই রূপ পরামর্শে অনেক গূঢ় ও জটিল বিষয়ও

অল্প সময়ের মধ্যে তর্ক বিতর্ক দ্বারা স্থির সিদ্ধান্তে আনিতে পারা যায়।

"যখন কাহাকেও পরামর্শ প্রদান করিতে হয়, তখন সেই ব্যক্তির পরামর্শানুযায়ী কার্য্য করার ক্ষমতা আছে কিনা চিন্তা করিয়া দেখা কর্ত্তব্য। কেহ কেহ পরামর্শ প্রদানের সময় এমন বিজ্ঞ ভাবে কথা বলেন যে উপদেশ গৃহীতার তৎসম্পাদন সাধ্যায়ত্ত কিনা তদ্বিষয় বিন্দুমাত্র বিচার করিয়া দেখেন না। ঐরূপ পরামর্শ গভীর জ্ঞানের পরিণাম হইলেও কার্য্যকারী হয় না।

তুমি যদি কোন লোকের কার্য্য নিয়মক বিধি পরিবর্ত্তন করিতে চাও, তাহা হইলে সেই কার্য্যটি সম্বন্ধে তোমারও তাহার মতের মধ্যে কি পার্থক্য তাহা বিশেষ নিপুনতার সহিত দেখাইয়া দিতে হইবে। কাহাকেও বল পূর্ব্বক এক মত হইতে মতান্তরে লইয়া যাওয়ার চেষ্টা করা অত্যন্ত কাপুরুষের কার্য্য। মানুষের মন স্বাধীন, যখন বিনা কারণে সেই স্বাধীনতার উপর আঘাত লাগে, তখন কে বলিবে যে সেরূপ প্রযাস বিধি সংগত?

পরামর্শের মধ্যে সতত যেন সরলতাও সাধুতা বিরাজ করে। যে পরামর্শ দাতার বাক্যগুলি কপটতা পূর্ণ, সে পরামর্শ দাতা নরকের কীট, তাহা দ্বারা আনন্দ ও মুক্তির পথ অবরুদ্ধ হইয়া থাকে।

সহ-সম্পাদক।

মনোরমা।

প্রথম পরিচ্ছেদ।

আজ শারদ পূর্ণিমা! সুধাংশুর সুবিমল কিরণে জগৎ উদ্ভাসিত; প্রকৃতি আজ নব সাজে সজ্জিত। তরঙ্গিনী কুলু কুলু শব্দে বহিয়া যাইতেছে। আজ সকলই আনন্দময়ী; শ্যামল প্রকৃতি হাসিতেছে, শ্যামল বল্লরী শোভিত বিটপীযুগল হাসিতেছে, গৃহমধ্যে প্রণয়ীযুগল হাসিতেছে। কেবল আজ একজনই বিষাদময়ী! কেননা সে মরিতে যাইতেছে।

যে আজীবন দুঃখের সহিত যুদ্ধ করিয়া আসিয়াছে, ক্ষুধায় চারিটি অন্ন না পাইয়া প্রতিবেশীর দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়াছে, এখন তাহাও মিলে না। জগতের মধ্যে বৃদ্ধা মাতা যাহার দুঃখে দুঃখী, সুখে সুখী হইত, সেও আজ নাই. তবে সে মরিবে না কেন? যাহার সুখের আকাঙ্ক্ষা একেবারে অন্তর্হিত হইয়াছে, একমাত্র বিষাদ যাহার হৃদয় অধিকার করিয়াছে, সে মরিবে না কেন? মরিলেই ত সমস্ত জ্বালা-যন্ত্রণার হস্ত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়া যায়। বিশেষতঃ মনোরমার ন্যায় বালিকা আর কত দিন এই কষ্ট সহ্য করিতে পারে।

মনোরমা বাল্যে পিতৃহীনা! মনোরমার বয়স যখন ২বৎসর মাত্র, তখন তাহার পিতা ইহলীলা সম্বরণ করেন। সংসারে তাহার একমাত্র দুঃখিনী মাতা ভিন্ন আর কেহ ছিল না। আজ এক বৎসর হইল তিনি ও ইহ-ধাম পরিত্যাগ করিয়াছেন; বুঝি বিধাতা শুধু দুঃখভোগ করিবার জন্যই মনোরমাকে সৃষ্টি করিয়াছেন। মনোরমার পিতার নাম হরিহর বসু; তিনি কোন জমীদারের অধীনে একটী সামান্য চাকুরি করিতেন। সুতরাং তিনি মৃত্যুকালে কিছুই রাখিয়া যাইতে পারেন নাই। মনোরমার মাতা কোন দূর সম্পর্কীয় এক ভ্রাতার নিকট হইতে কিছু কিছু সহায্য পাইতেন; এবং চরকা কাটিয়া সুতা বেচিয়া যাহা কিছু উপার্জ্জন হইত, তদ্দারা মাতা ও কন্যার অতি কষ্টে ভরণ পোষণ হইত। এখনকার মত তখন এত বিবিয়ানার প্রচলন হয় নাই; সুতরাং তাহাতে তাঁহারা লজ্জাবোধ করিতেন না। তাঁহার মৃত্যুর প্রায় ২মাস পূর্ব্বে তাঁহার ঐ-ভ্রাতার কাল হইয়াছিল সুতরাং মৃত্যুকালে তিনিও বড় কষ্ট পাইয়াছিলেন। প্রতি-বেশীরা দয়া করিয়া যে দিন যাহা দিত তাহাতে উভয়ের একবেলা আহার হইত, কোন কোনও দিন তাহাও মিলিত না। মাতার মৃত্যুর পর—মনোরমার কষ্টের অবধি রহিল না। তাহার বয়স সবে মাত্র পঞ্চদশ অতিক্রম করিয়াছে। যৌবনের সকল চিহ্নই দেখা গিয়াছে। কিন্তু তাহা হইলে কি হয়? সে আজ মরিতে আসিয়াছে।

ত্রিস্রোতা আজ গা ভাসাইয়া চলিয়াছে। তরঙ্গ তাহাকে স্নেহময় স্বরে ডাকিল,—"এস বালিকা আমার কোলে আইস, তোমার সকল যন্ত্রণার অবসান হইবে।" বালিকা তাহার কথা আর উপেক্ষা করিতে পারিল না, সে ত্রিস্রোতার খর স্রোতে ঝম্প প্রদান করিল। তরঙ্গের উপর দুই একটি উত্তাল তরঙ্গ উঠিয়া তখনই আবার স্থির হইয়া গেল।

মরিয়াও মনোরমার সুখ নাই! গ্রামের লোকে কত কথা বলিতে লাগিল; যাহারা স্নেহ করিত,—তাহারা বলিল "আহা, খাইতে না পাইয়া অভাগিনী হয়ত সন্যাসিনী হইয়া গিয়াছে।" কেহ বলিল,—"সন্ন্যাসিনী হবে কেন, সে জলে ডুবিয়া মরিয়াছে"। এতভিন্ন কুলোকে কথা কুকথা রটাইতে লাগিল, কেহ বলিল যে, আমি কাল সন্ধ্যাবেলায় একটী যুবকের সহিত তাহাকে যাইতে দেখিয়াছি ইত্যাদি। বাঙ্গালার স্বভাবই এই, আপনিও তাহাকে সাহায্য করিবে না, উপরন্তু সে যদি কোথাও চলিয়া যায় বা কিছু করে তাহার নামে কলঙ্ক রটাইতে বিন্দুমাত্র লজ্জিত হয় না।

———

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

হরিহরপুরের জমিদার নরেন্দ্র নাথ মিত্র নরেন্দ্র বাবুর বিশাল জমিদারি। বার্ষিক আয়, খরচ খরচা বাদে, প্রায় ষাট হাজার টাকা। চারিদিকে চক মিলান সুন্দর অট্টালিকা! গাড়ী, ঘোড়া, পাল্কী প্রভৃতিরও অভাব নাই। ইহা ব্যতীত কলিকাতায় ইংরাজটোলায় ৮।১০ খানা বাড়ী আছে।

নরেন্দ্রবাবু বনিয়াদি জমিদার। তাঁহার বাড়িতে বার মাসে তের পার্ব্বণ হয়। সে পার্ব্বণে আত্মীয় কুটুম্ব, অপেক্ষা দরিদ্রগণের আনন্দই অধিক। তাহারা পেট ভরিয়া সপ্তাহকাল চর্ব্ব, চুষ্য, লেহ্য, পেয় দ্বারা উদর পূর্ত্তি করিবে এবং ৺পূজায় সময় মিত্র মহাশয়ের প্রদত্ত নূতন কাপড় পরিধান করিয়া আপনাদিগকে চরিতার্থ জ্ঞান করিবে। তিনি একদিকে যেমন প্রজারঞ্জক ছিলেন অন্যদিকে তেমনি একজন অসাধারণ ক্ষমতাশালী ছিলেন। তাঁহার জমিদারির মধ্যে কেহ কখন চুরি ডাকাতি হইতে শুনে নাই বা গ্রামের লোককে কখন আদালতের আশ্রয় গ্রহণ করিতে দেখে নাই। সুতরাং মিত্র মহাশয় সর্ব্ব বিষয়ে সুখী।

তাঁহার একমাত্র পুত্র যতীন্দ্রনাথ এবার বি, এ, পরীক্ষায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করিয়াছে। ইহা উপলক্ষে তিনি গ্রামস্থ দরিদ্রদিগকে একটি ভোজ দিয়াছিলেন।। এক্ষণে নরেন্দ্রবাবু পুত্রের বিবাহের জন্য বিশেষ ব্যস্ত। এখন তিনি একটি সংকুলোদ্ভবা পাত্রীর সন্ধান করিতেছেন, কিন্তু তাঁহার মনোমত পাত্রী এ অঞ্চলে মিলিল না। সুতরাং পুত্রের বিবাহ জন্য তিনি কলিকাতা যাইতে মনস্থ করিলেন। আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি, এখনকার মত তখন চারিদিকে রেল হয় নাই। সকলকে প্রায় জলপথে বা হাঁটিয়া গমনাগমন করিতে হইত।

নরেন্দ্র বাবু শুভদিন দেখিয়া কলিকাতা যাত্রা করিলেন। নৌকা হরিহরপুর পার হইতেই সন্ধ্যা হইয়া আসিল। তিনি মাঝিদিগকে নৌকা বাঁধিতে আদেশ করিলেন। মাঝিরা সেই স্থানে নৌকা নঙ্গর করিল এবং রন্ধনের উদ্যোগ করিতে লাগিল। কেহ বা জঙ্গলে কাষ্ঠ সংগ্রহের জন্য গমন করিল, কেহ বা গীত গাহিতে লাগিল। তখনকার দিনে হিন্দুর মধ্যে, সন্ধ্যাহ্নিক কর্ত্তব্য কর্ম্মই প্রধান ছিল। কিন্তু এখন আর তাহা নাই। বাবু প্রাতে উঠিয়াই চা পান করেন, সংবাদপত্র পাঠ করেন, সন্ধ্যাকালে ইয়ার বন্ধুর সহিত তাস ও দাবা লইয়া বসেন; কেহ বলিল—"উহা একটী কুসংস্কার মাত্র! প্রকৃতি বলিয়া তাঁহারা কাটাইয়া দেন। কিন্তু তখনকার দিনে এরূপ করিলে সমাজচ্যুত হইতেন, এখনও পল্লীগ্রামে ইহার কিছু কিছু দেখিতে পাওয়া

যায়। এমন সময় একজন নাবিক আসিয়া সংবাদ দিল—"বাবু, আমাদের নৌকার বিশ রশি দূরে একটি মানুষ ভাসিতেছে; তাঁহাকে তুলিব কি?" ইহা শুনিয়া তিনি শীঘ্র শীঘ্র পূজাহ্নিক সারিয়া লইলেন এবং যেস্থানে মৃতদেহ ভাসিতেছে, দেখিতে চলিলেন। তিনি দেখিলেন, এক অনিন্দ্য সুন্দরী বালিকা নদীবক্ষে ভাসিতেছে; তরঙ্গমালা তাহাকে লইয়া ক্রীড়া করিতেছে। বালিকার মুখশ্রী এখনও বিকৃত হয় নাই, যেন নদীবক্ষে পদ্ম ফুটিয়াছে। তৎক্ষণাৎ তিনি মাঝিদিগকে তুলিতে আদেশ করিলেন। তাঁহার আদেশ সত্বর সম্পন্ন হইল; তিনি কপালে হাত দিয়া দেখিলেন, কপাল অপেক্ষাকৃত মৃদু উষ্ণ। তখনই তিনি মাঝিদিগকে অগ্নি জ্বালিতে বলিলেন। এবং কৃত্রিম উপায় দ্বারা শ্বাসপ্রশ্বাস বহাইবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন; মাঝিদের মধ্যে একজন বৃদ্ধ মাঝি তাহার হস্তপদে তাপ দিতে আরম্ভ করিল। প্রায় দুই ঘণ্টা পরিশ্রমের পর নরেনবাবু দেখিলেন, তাঁহার মৃদু মৃদু নিশ্বাস বহিতেছে। তখন তিনি মুখে একটু একটু দুগ্ধ ঢালিয়া দিতে লাগিলেন। ক্রমে বালিকার দেহে প্রাণ সঞ্চার হইল, নরেনবাবু আজ একটি জীবের প্রাণ রক্ষা করিতে পারিলেন দেখিয়া, ঈশ্বরকে শত শত ধন্যবাদ দিতে লাগিলেন। তাঁহার আর কলিকাতায় যাওয়া হইল না প্রভাতে, তিনি মাঝিদিগকে পুনরায় বাটী অভিমুখে নৌকা লইয়া যাইতে আজ্ঞা করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

পূর্ব্বে বলিয়াছি বালিকা অপেক্ষাকৃত সুস্থ হইয়াছিল। এক্ষণে নরেন বাবুর স্ত্রীর যত্নে ক্রমে আরোগ্যের পথে ধাবিত হইল, তখন সে মিত্র মহাশয়ের বাটীতে পালঙ্কের উপর শায়িত; সে এখানে কি প্রকারে আসিল কিছুই বুঝিতে পারিল না। এমন সময় গৃহিণী আসিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন "মা ভাবছ কি? তুমি কি আমাদের পর!" বালিকা উত্তর করিল "মা কেন এ অভাগিনীকে প্রাণদান দিলেন? তাহার জীবনে কোন সুখ নাই, তাহার বাঁচিয়া ফল কি?" গৃহিণী বলিলেন—'ছিঃ বাছা' ও কথা কি বলতে আছে? পরমেশ্বরের ইচ্ছা তুমি বাঁচ্‌বে; ইহাতে মানুষের কি কোন হাত আছে? যদি মনে করিলেই মরা হইত তাহা হইলে গরীব দুঃখী সকলেই মরিতে পারিত। তোমাকে ভদ্রঘরের কন্যা বলিয়া বোধ হইতেছে; তুমি কি প্রকারে জলে ডুবিয়া গিয়াছিলে?" বালিকা একে একে তাহার জীবন-বৃত্তান্ত বলিতে লাগিল। গৃহিণী ক্রমে তাহার পরিচয় লইয়া জানিলেন

যে, সে এখনও অবিবাহিতা ও সদ্বংশজাত এবং তাহাদের পালটী ঘর। গৃহিণী মনে মনে তাহার সহিত পুত্রের বিবাহ দিবার সঙ্কল্প করিলেন। এইরূপ সুন্দরীর সহিত বিবাহ দিতে কাহার না ইচ্ছা হয়; কিন্তু কর্ত্তার মতামত হইবে কিনা তজ্জন্য চিন্তিত হইলেন।

নরেনবাবু আহার করিতে বসিয়াছেন। সম্মুখে গৃহিণী ব্যজনী হস্তে ব্যজন করিতেছেন। ক্রমে নানাকথার পর বলিলেন,—"একটী কথা বলিব, রাগ করবে না?"

"কোন দিন রাগ করিয়াছি, যা বলবে তা বল না।"

"বলিতেছিলাম এই মেয়েটির সঙ্গে যতীনের বিবাহ দিলে হয় না।"

"আচ্ছা দেখা যাবে,"

"ও কথা রাখ, সত্য করে বল।"

"যার তার সঙ্গে কি পুত্রের বিবাহ দিলেই হইল? উহার জাতি কুলের পরিচয় জানি না; আর তুমি উহার সহিত পুত্রের বিবাহ দিতে বলিতেছ!"

"সে সমস্ত না জানিয়া কি তোমাকে বলিতেছি। আমি উহার নিকট হইতে সংবাদ লইয়াছি, উহারা আমাদের পালটী ঘর।"

"সেত আর উহার নিকট শুধু শুনিলে হইবে না। উহাদের দেশে গিয়া খবর লইতে হইবে।"

"তাতো ঠিক।"

"আমি আগামী পরশ্ব কলিকাতা যাত্রা করিব, মনে করছি। সেই সঙ্গে উহাদের গ্রামে যাইব এবং সমস্ত সংবাদ লইব।"

বলা বাহুল্য গৃহিণী আহ্লাদে আটখানা হইলেন। কিন্তু কলিকাতা যাত্রা শুনিয়া কিছু চিন্তিতা হইলেও জিজ্ঞাসা করিলেন,—"কলিকাতায় কি দরকার? কিছু বিষয় কর্ম্ম আছে"?

পাঠক! বুঝিতে পারিয়াছেন কি বালিকাটিকে? ইনিই আপনাদের সেই পূর্ব্ব পরিচিতা মনোরমা! হরিপুর হইতে মনোরমাদের গ্রাম অধিক দূর নয়; দশ ক্রোশের মধ্যে হইবে। পথিমধ্যে নরেন বাবু এই জন্যই তাহার সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন।

চতুর্থ পরিচ্ছেদ।

মনোরমা এখন সম্পূর্ণ সুস্থ হইয়াছে। সে এখন গৃহিণীর নিকট হইতে কাড়িয়া একাজ ওকাজ করে। গৃহিণীও তাহাকে কন্যাবৎ স্নেহ করেন।

দিবা দ্বিপ্রহর অতীত হইয়াছে। সকলের আহারাদি হইয়া গিয়াছে গৃহিণী ও মনোরমা উভয়ে বসিয়া গল্প করিতেছেন, এই সময়ে যতীনের কথার উপস্থিত হইল। যতীন

বাবু প্রায় ১মাস বাটিতে ছিলেন না; জমিদারিতে গিয়াছিলেন। এক্ষণে আসিয়াই একজন অপরিচিতাকে দেখিয়া কিছু বিস্মিত হইলেন। জননী পুত্রকে আসিতে দেখিয়া তৎক্ষণাৎ উঠিয়া যাইলেন, এবং পুত্রের জলযোগের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন।

যতীন বাবু আহারে প্রবৃত্ত হইলেন এবং বালিকাটি কে তাহা জননীকে জিজ্ঞাসা করিলেন। গৃহিণী আদ্যোপান্ত পুত্রের নিকট বলিলেন।

মা মনো, একটী পান দিয়ে যাও তো!

তৎক্ষণাৎ এক অনিন্দ্য সুন্দরী বালিকা উপস্থিত হইল এবং গৃহিণীর হস্তে ২টী পান প্রদান করিল। যতীন বাবু এতক্ষণ তাহকে দেখিবার অবসর পান নাই; এক্ষণে দেখিলেন,—তাহার ইন্দীবর বিনিন্দিত আনন, বিস্ফারিত চক্ষু, তদুপরি কামধনু তুল্য ভ্রূযুগল, নয়নাসনে যেন স্বয়ং রতিপতি বিরাজিত; মুখখানি যেন বিধাতা নির্জ্জনে বসিয়া গঠন করিয়াছেন। যতীন বাবু এ হেন বলিকার রূপ সাগরে ডুবিয়া গেলেন; এক দৃষ্টে তাহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। চারি চক্ষের মিলন হইল, এইবার বালিকা লজ্জায় ঘাড় হেট করিল, ও তথা হইতে প্রস্থান করিল।

জমিদারী হইতে আসা পর্য্যন্ত যতীনের আর সে ভাব নাই। তাহার রুচি নাই, কাঞ্চন তুল্য শরীর কে যেন কালিমাময় করিয়া দিয়াছে। সর্ব্বদাই যেন বিষণ্ণ, গৃহিণী তাহার এরূপ ভারান্তর দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—"বাবা যতীন, তোমার কি কোন অসুখ হইয়াছে।

পুত্র—"কৈ না কিছু না।"

গৃহিণীর আর বুঝিতে বাকি রহিল না। কর্ত্তা আসিলেই এ বিষয়ের যে বন্দোবস্ত হয় করিতে হইবে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃঢ় প্রতিজ্ঞ হইলেন।

আর মনোরমা, সে এখন আর যতীনের সম্মুখে বাহির হয় না। তাহাকে দেখিলেই তাহার প্রাণের ভিতর বিদ্যুৎস্ফুরণ হয় কিন্তু তাহাকে দেখিতে মন যেন সর্ব্বদা ইচ্ছা করে। এখন মনোরমা বাটী সংলগ্ন উদ্যানে প্রায় একাকী ভ্রমণ করে এবং পুষ্করিণীর সোপানের উপর বসিয়া কি চিন্তা করে।

মনোরমা তোমার ত কোন কষ্ট নাই? তবে তোমার চিন্তা কিসের? পিতা মাতা তাঁহারা ত বহুদিন ইহধাম ত্যাগ করিয়াছেন। তোমার আর ত কোন আত্মীয় নাই, যাহকে দেখিবার জন্য তোমার প্রাণ অস্থির হয়।

দিনমণি অস্তাচলচূড়াবলম্বী হইলেন। পশ্চিম গগণ গাত্র কে যেন সিন্দুরে রঞ্জিত করিয়াছিল। পাপিয়া দহিয়াল প্রভৃতি পক্ষিগণ তাহাদের স্বভাব সুন্দর সুললিত কণ্ঠে প্রভাকরের বন্দনা করিতে লাগিল। কমলিনী প্রিয়পতি বিরহে অধৈর্য্য হইয়া ঘোমটা টানিয়া দিলেন এবং যৌবনোন্মুখী কুমুদ কহ্লার তাহার দুর্দ্দশা দেখিয়া হাস্য করিতে লাগিল।

মনোরমা এখনও সরসী তীরে, সোপানের উপর করতলে মস্তক ন্যস্ত করিয়া বসিয়া আছে। "সে কি আমার হবে?—না একথা মনে স্থান দিলেও পাপ হয়। তবে আজ হইতে আমি তাহার চিন্তা পরিত্যাগ করিব? তাই বা কি করিয়া পরিত্যাগ করি? যাহার সহিত প্রত্যহ চারি চক্ষে মিলন হইবে, তাহাকে কেমন করিয়া ভুলিব? তাঁহার মূর্ত্তি চিরতরে হৃদয়ে অঙ্কিত থাকিবে।" এমন সময় একজন বাধা দিয়া বলিল,—"কাহার মূর্ত্তি মনোরমা?"

বালিকার চক্ষু হইতে বারিধারা বহিতে লাগিল।

"মনো! তুমি কাঁদছ? তোমাপেক্ষা আমি ধৈর্য্য ধরিয়া আছি; তাহা কি দেখিতে পাও না? আমি তোমারই জন্য আহার নিদ্রা পরিত্যাগ করিয়াছি, তোমারই কারণে নিশিদিন দুঃখে অতিবাহিত করিতেছি।"

"দেখুন যতিন বাবু আপনি বড় লোকের ছেলে। আমার ন্যায় দুঃখিনীর সহিত আপনার এ ভাব কখন ভাল দেখায় না। কারণ, আমার পক্ষে ইহা বামনের চন্দ্রস্পর্শ আশার ন্যায় বৃথা আয়াস মাত্র। পরিশ্রমই সার হইবে; অধিকন্তু অপহাস্যের সম্ভাবনা। আপনি এ সঙ্কল্প ত্যাগ করুন।

"এ জনমে ভুলিতে পারিব না। আমি মা ও বাবাকে ইহার জন্য অনুরোধ করিব, কে যেন আমার অন্তর হইতে বলিতেছে, "এ রত্ন তোমারই জন্য"।

বালিকা আর কথা কহিতে পারিল না।

যতীন বাবু তাহাকে হৃদয় মাঝে টানিয়া লইলেন ও বলিলেন,—"মনো, আমি তোমা ভিন্ন আর কাহাকেও এ জীবনে ভালবাসিতে পারিব না।" "তোমা ভিন্ন এ হৃদয়ে কাহারও স্থান নাই"—বলিয়া তাহার গোলাপ-গণ্ডে একটী চুম্বন করিল। পরে প্রেমিক প্রেমিকার কত কথা হইল। পাঠক! সে কথা আর আপনার শুনিয়া কাজ নাই। তার পর প্রণয়ী যুগল উভয়ের গন্তব্য পথে গমন করিলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীনগেন্দ্রনাথ ঘোষ।

উষা কীর্ত্তন।

ওঁ প্রাণারাম মধুর ব্রহ্ম নাম প্রাণ খুলে
সবে মিলে গাই অবিরাম।
[ওহে] চিদাকাশে, নীলাকাশে ব্রহ্মজ্যোতি পরকাশে,
নিত্য প্রকাশে হে,
ঐ পিককুল কুহুস্বরে, মধুর ঝঙ্কার ক'রে
বলে জাগ জাগ নিশি অবসান॥

[ওহে] ... প্রাণে, ... ভক্তগণে,
বিভুগুণ গানে মাতায় হে,
সেই নাম ... ধূলি ল'য়ে
... জয় জয় জয় ... ।
[যে] ... নাম সাধনে, যোগী ঋষি তপোবনে
না পায় অন্ত হে,
[আজি] সেই নাম ঘরে ঘরে প্রেমময় রূপ ধ'রে
পাপিগণে দেয় পরিত্রাণ ॥

শ্রীঅভরণ চন্দ্র রায়।

মাসিক সংবাদ ও সমালোচনা

১। বঙ্গবাসী (২) বসুমতী (৩) টেলিগ্রাফ (৪) বার্ত্তাবহ (৫) হাওড়া হিতৈষী (৬) সোনার ভারত (৭) সমাজদর্পণ (৮) বঙ্গদর্শন (৯) ভারতী (১০) নব্যভারত (১১) সাবিত্রি (১২) Gardeners Magazine (১৩) মহাজন বন্ধু (১৪) বসুধা (১৫) আর্য্যবিভূতি (১৬) বাসনা (১৭) অবসর (১৮) সাচ্চাবী সুহৃদ (১৯) পন্থা (২০) বামাবোধিনী (২১) স্বদেশী (২২) অঙ্কুর (২৩) জাহ্নবী (২৪) জগজ্জ্যোতি (২৫) উপাসনা (২৬) এডুকেশন গেজেট।

সাচ্চাবী সুহৃদ। শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র দেব কবিকৌমুদী সম্পাদিত। বর্ষিক মূল্য ১৲। আমরা ইহার কয়েক সংখ্যা প্রাপ্ত হইয়াছি। আজ কাল যেরূপ সময় পড়িয়াছে, তাহাতে এরূপ মাসিক পত্রের প্রচার যত অধিক হইবে, ততই মঙ্গল। পত্রিকা খানি পড়িয়া আমরা বিশেষ প্রীত হইয়াছি। সহযোগী দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া স্বদেশের কার্য্যে ব্রতী হইলে আমরা সুখী হইব।

কলেরা শিক্ষা। ডাক্তার শ্রীযুক্ত সুরথ চন্দ্র মিত্র, এল, এম (হোমিও) প্রণীত। মূল্য ।০ আনা। ডাক্তার সুরথবাবু হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসায় বিশেষ পারদর্শী; আজ ... বৎসর চিকিৎসা কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া তিনি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছেন, এই পুস্তকে তিনি ... করিয়াছেন। কলেরা চিকিৎসার পুস্তকখানি বিশেষ প্রয়োজনীয় হইয়াছে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। ভাষা এত দূর সরল ও সহজ হইয়াছে যে সামান্য শিক্ষিতা রমণীগণও রোগের প্রথমাবস্থায় ইহার দ্বারা অনেক উপকার পাইতে পারেন। আমরা আলোচনার পাঠকগণকে ইহার এক খানি করিয়া খরিদ করিতে অনুরোধ করি। ১০৫নং পঞ্চানন তলা রোড, হাওড়া গ্রন্থকারের নিকট পাওয়া যায়।

নূতন মাসিক। শুনিতেছি, হাওড়া হইতে "মানসী" নামে আর এক খানি মাসিক পত্র সত্বর প্রকাশ হইবে। "আলোচনার" লেখক শ্রীযুক্ত সুবোধ চন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি এ ইহার সম্পাদন-ভার গ্রহণ করিয়াছেন। প্রসিদ্ধ লেখকগণও ইহাতে লেখনী চালনা করিবেন। বার্ষিক মূল্য ২।৵০ আনা। ভগবান সম্পাদকের মনোবাসনা পূর্ণ করুন—ইহাই প্রার্থনা।

প্রেস বাজেয়াপ্ত। বিগত ২১শে নভেম্বর তারিখে "সোনার ভারত" নামক সংবাদ পত্রে একটী রাজবিদ্রোহমূলক প্রবন্ধ প্রকাশের অভিযোগে বিগত ২১শে জানুয়ারী তারিখে হাওড়া "সুলভ হিতৈষী" প্রেস গবর্ণমেন্ট বাজেয়াপ্ত করিয়াছেন। আগামী ৩রা ফেব্রুয়ারী মকর্দ্দমার দিন পড়িয়াছে।

স্বদেশী বাউল সঙ্গীত।

কত দিন এমনি ঠাটে কাঠের পায়ে
দাঁড়াবি এ ভবের মাঠে।
মাটিতে পড়িলে যাই, এসে যেন দাই
চুবয় টবে পিয়ার্স গায়ে।
ভ্যাসলেট্ শুদ্ধ ছড়ায়, সমস্ত গায়,
ফ্রগ্ বিলাতি দেয় পরায়ে।
বলে মা দুগ্ধহীন, ভরামিন দুধের
পানে থাক চেয়ে।
ছেড়ে সব পিঠে, পুলী খায় জেলী,
চাক্ চকন্সি বাঁচ খেয়ে।
বিদ্যারম্ভ যখন, মিথ্যাক মিলন
শিশুবোধন দেয় পাঠিয়ে।
কালে পাঠশালা ছাড়ি, বাইক চড়ি
সাহেব বাড়ী পড় গিয়ে।
না জিতে গোঁফের রেখা, হ'ল শেখা
সিগারেট ধুঁয়া টানা।
চকমকি পাথর গেল, শলাই আলো
পকেটেতে আনাগোনা।
[illegible] সিন্ধুতীরে, সৈন্ধবেরে
[illegible] ওমাস্কত্ব।
[illegible] খেয়ে [illegible] শেষে
গুনদাতারে ডাক প্রভু।
দিয়ে ঠাকুর বসন, লজ্জা-ভূষণ
ক'রতো আগে তাঁতি-দলে,
এখন সব মাকা লাটু, ঢাকি হাঁটু
(তোমাদের) জীবন লাটু ঘুরায় কলে।
আগে সব চরকা টেনে পয়সা এনে,
মানুষ কত করতো বুড়ী।
এখন সব চাঁপার কলি, আঙুল গুলি,
উলের গুড়ি নাড়ানাড়ি।
মোদের ঢাকাই শাঁখে, ফেলে রেখে
ঠুনকো কাঁচে হাত সাজালে
দেশের এই সোনা ফেলে, কোন
আক্কেলে, কেমিক্যালে মন মজালে।
(আমাদের) তামা কাঁশা, কত খাসা
এনেমেলের চক চকিতে
একবার উঠিলে কলাই
সকলি ছাই, ছাই দিয়ে কেউ চায় না নিতে।
আগে ছিল দান ধর্ম্ম, নিত্য কর্ম্ম
এখন তারক ব্রহ্ম রূপ অবতার,
এখন সব রায় বাহাদুরী, রাজাগিরি
স্বর্গের সিঁড়ি করে তৈয়ার।
সেই সিমেন্ট হলে, মিলে গলে
ভিক্ষার ঝুলি পরম সুখে,
তাই হ'লো এক শিক্ষা, কেবল ভিক্ষা
দীক্ষা পাবে আবৃত্তি শিখে।

পরের মায়ে ধুন বিলায়ে
মায়ে দুঃখিনী ক'ন্দে শেষে
তাঁই পরের মুখাপেক্ষা, আওয়াজ কর্ত্তা
কর ভিক্ষা পুত্র বেশে।

নিজের পায়ের উপর করিয়ে ভর
মায়ের কাছে দাঁড়াও দেখি
বাউল কাঙ্গাল তাই দেখে
মনের সুখে আখেরিতে মুদ্‌বে আঁখি।

ডাক্তার—শ্রীসুন্দরী মোহন দাস।

ব্রহ্ম-তত্ত্ব।

(ব্রহ্মসঙ্গীতে ব্রহ্ম-তত্ত্ব—নববিধান সঙ্গীত)

ব্রহ্মসঙ্গীতে ব্রহ্মতত্ত্ব বিকাশের উচ্চতম অবস্থা নববিধান সঙ্গীতেই প্রকাশিত। নববিধান সমাজের প্রকাশিত সঙ্গীত পুস্তকের দ্বিতীয় হইতে দশম ভাগ পর্য্যন্ত আমি এই প্রবন্ধে নববিধানের অন্তর্গত বলিয়া ধরিয়া লইলাম। দ্বিতীয় ভাগ সঙ্গীত পুস্তক সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মের দুই বৎসর পরে ৫১ ব্রাহ্ম অব্দে, ১৮০২ শকে মুদ্রিত হইয়াছিল বলিয়া বোধ হয়; কেন না, এই ভাগে পঞ্চাশত্তম সাম্বৎসরিকের নগরকীর্ত্তন পর্য্যন্ত মুদ্রিত হইয়াছে। এক অর্থে, ইহার অধিকাংশ সঙ্গীতই ভারতবর্ষীয় সমাজের, সন্দেহ নাই। কিন্তু নববিধানের আয়োজন সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মের পূর্ব্ব হইতেই হইতেছিল। এই জন্য পূর্ব্ব প্রবন্ধাংশে আমি ১৭৮৭ হইতে ১৮০২ শক পর্য্যন্ত নববিধানের গর্ভবাসকালরূপে বর্ণনা করিয়াছিলাম। এই কালের সঙ্গীত এই কারণে নববিধান সঙ্গীতের অঙ্গরূপে গৃহীত হওয়া অন্যায় নহে।

ব্রাহ্মসমাজে, ব্রহ্মসঙ্গীতের মধ্য দিয়া ব্রহ্মতত্ত্ব যতটা বিকশিত হইয়াছে, তন্মধ্যে নববিধান সঙ্গীতে তাহার শ্রেষ্ঠতম বিকাশ দৃষ্ট হয়, এই কথা বলাতে আমি নববিধান সঙ্গীতের সকল সঙ্গীতই অতি উৎকৃষ্ট ও উচ্চ ব্রহ্মতত্ত্ব-প্রকাশক, এরূপ বলিতেছি বলিয়া যেন কেহ ভ্রম না করেন। এই সকল সঙ্গীতের গুণ যেমন বেশী, দোষও তেমনি অনেক। অগ্রে তাহার দোষেরই বিচার করিয়া, বর্ত্তমান প্রবন্ধের সমালোচকগণের শ্রেণী বিশেষের বিরুদ্ধ সমালোচনার সুযোগ হ্রাস করা মন্দ নহে।

নববিধান সঙ্গীতের প্রথম দোষ ভাবুকতার উদ্দাম আস্ফালন। রামমোহন রায়ের সময়ের ব্রহ্মসঙ্গীতে ভাবস্ফূর্ত্তি নাই বলিলেও অত্যুক্তি হয় না। আদি সমাজের সঙ্গীতে ভাব আছে বটে, কিন্তু তাহা অধিকাংশ ভাবে সংযত ও অবরুদ্ধ; নববিধান সঙ্গীতে তাহার বিপরীত, অবৈধরূপে ভাব এ সঙ্গীতে উদ্দামমূর্ত্তি ধারণ করিয়াছে। এই জন্য এমন কি কোন কোন স্থলে এই সকল সঙ্গীত গ্রাম্যভাবে দুষ্ট হইয়া উঠিয়াছে। একটী সঙ্গীতে আছে :—

ধর্ম্মের ঘরে চুরি করে লুকান কি যায়।

(ও মন)

সেথা আছে যে সকল, দেবদূত দল,

দেখ্‌লে চিন্‌তে পারে চেহারায়। (লোক)

কেরে ঠাকুর ঘরে, বলে উচ্চৈঃস্বরে,

যখন তারা ডাকিয়ে শুধায়?

তখন বলে চোর সবে, ভয়ভয় রবে,

আমরা কলা খাইনি গো মশায়।

গোলমালে হরি বলে,স্বর্গধামে প্রবেশিলে,

পড়বি রে বিষম সমস্যায়;

শোন্ পাটোয়ারী, কুবুদ্ধি চাতুরী,

চলিবে না কখনো হেথায়;

ওরে বড়ই চতুর, মোদের ঠাকুর,

করেন ফতুর যে তাহারে চায়।

ওরে মনচোর লজ্জা নাই তোর,

সাধুবেশে চুরি পুনরায়;

দীন প্রেমদাসে ভণে, কাতর বচনে,

ঠেকে শিখলি নারে হায় হায়।

আর একটী সঙ্গীত ইহা অপেক্ষাও যেন আরো বেশী গ্রাম্যভাব ও ভাষাতে পরিপূর্ণ। যথা :—

হরিনামের সুরাপান করিয়া এবার

আমি মাতাল হব।

পিপে ধরে মার্ব্বো যে টান,

আর পান করে আশা মিটাব॥

(নামের সুরা)

গরল উঠে বিষয় মদে,

কাজ কি আমার সে সকল মদে,

পান করে সেই আসল মদে,

লজ্জাভয় ত্যেয়াগিব॥

ভক্তিবাড়ী কর্ব্বো বাসা, পুরাইব সকল আশা,

নিবারি দারুণ পিপাসা চাখ্না নাম ঘুচাইব।

(১১ ২ ' । ৬০৮, ৬১৮ ও ৬২০ ও দ্রষ্টব্য।)

স্থলবিশেষে গ্রাম্যভাব ও ভাষাতে ভাবের সারল্য বা গভীরতা প্রকাশ পায় বটে, কিন্তু এই যে দুটী সঙ্গীত এস্থলে উদ্ধৃত করিলাম ইহাতে তাহার কিছুই নাই, অথচ অযথা ভাবে গ্রাম্য ভাবের ছড়াছড়ি।* ইহা উদ্দাম ভাবুকতার ফল।

একদিকে যেমন এই ভাবের উদ্দাম আস্ফালন নিবন্ধন নববিধান সঙ্গীত স্থানে স্থানে গ্রাম্যভাব-দুষ্ট হইয়াছে, সেইরূপ অন্য দিকে আবার স্থানে স্থানে প্রচলিত ধর্ম্মের দেবদেবীর নামে বলপূর্ব্বক একটা ব্রাহ্ম-অর্থ আরোপ করিবার চেষ্টা করিয়া ব্রহ্ম-সঙ্গীতের বিশেষত্ব ও বিশুদ্ধতা বিনষ্ট করিবার পথ করিয়া দিয়াছে। দেবদেবী রূপে যে ভাব বা যে নাম দেশ মধ্যে গৃহীত বা প্রচারিত হইয়াছে, তাহাই যে ব্রাহ্মগণের বর্জ্জন করা আবশ্যক বা বিধেয়, এরূপ কখনই মনে করি না। তাহা সম্ভবপর বলিয়াও বোধ হয় না। কারণ শিব, ঈশ্বর, বিশ্বজননী, আনন্দময়ী, প্রভৃতি অনেক শব্দই প্রচলিত ধর্ম্মের দেব-দেবীগণে আরোপিত হইয়া থাকে। কিন্তু সকল বিষয়েই একটা সীমা আছে। এক দিকে যেমন দেবদেবীতে প্রযুক্ত হয় বলিয়া হরি, শিব, প্রভৃতি শব্দ ব্রহ্মপূজার পদ্ধতি হইতে বর্জ্জন করিবার জন্য আন্দোলন অযৌক্তিক, সেইরূপ যৌগিক অর্থ গ্রহণ করিয়া, বা আধ্যাত্মিক ব্যাখ্যা প্রদান করিয়া কালী করালী, দুর্গা, প্রভৃতি নাম ও ব্রহ্মে প্রয়োগ

করিবার আকাঙ্ক্ষা উদ্ভট। কিন্তু স্থলে স্থলে নববিধান সঙ্গীতে এই উদ্ভট আকাঙ্ক্ষার বিশেষ পরিচয় পাওয়া গিয়া থাকে। যেমন ৫৭২ সংখ্যক সঙ্গীতে, ঈশ্বরকে—মহাবিদ্যা মা শঙ্করী,ভববাণী ভৈরবী, সুরাসুরবিমর্দ্দিনী, ভগবতী, অম্বিকে, অম্বে, মহাসতী, শিবে, সর্ব্বার্থসাধিনী, ইত্যাদি নাম প্রদান করা হইয়াছে। (৮১২ ও ৮১৫ দ্রষ্টব্য) ব্যাকরণ, গত অর্থ করিলে যে এ সকল শব্দ সঙ্গতরূপে ঈশ্বরে প্রযুক্ত হইতে পারে না, তাহা নহে, কিন্তু কেবল বৈয়াকরনিক ধাত্বর্থেই ভাষায় শব্দ প্রযোগ হয় না। ব্রহ্মকে শঙ্করী, মহাবিদ্যা, ভৈরবী, এমন কি কালী, করালী বলাতেও ব্যক্তিগত ভাবে, কাহারও কোন আপত্তি না থাকিতে পারে। এই জন্য শাক্ত উপাসকের ভক্তি-কম্পিত কণ্ঠে শ্যামা-বিষয়ক গান ভক্ত শুনিয়া ব্রাহ্মও আপনি ভক্তিরসে আপ্লুত হইতে পারেন। সে এক কথা। আর জোর করিয়া টেনে বুনে, এই সকল শব্দ ব্রহ্মসঙ্গীতের দেহ-বদ্ধ করা অন্য কথায় ইহাতে ব্রাহ্ম ও শাক্ত উভয়েরই প্রতি অবিচার করা হয়। নব বিধান সঙ্গীতের স্থলে স্থলে এই দোষ দৃষ্ট হইয়া থাকে।

এতদ্ব্যতীত নববিধান সঙ্গীতের অনেক স্থানে অজীর্ণ বৈষ্ণব ভাব ও বৈষ্ণব তত্ত্বের উদ্গিরণের বিকট গন্ধেও মনে বিশেষ বিতৃষ্ণার সঞ্চার হইয়া থাকে। যথা একটী সঙ্গীতে প্রথমে মধুর ভাবের অবতারণা করা হইয়াছে।

যদি বৃন্দাবনে হরি হে,
তুমি কত লীলা দেখাইলে!
(ভাব যে ধরতে নারি)
তে মার একার রূপে পরাণ আকুল,
আবার তার সঙ্গে ভক্তকুল।
যুগল মূরতি পুরুষ প্রকৃতি,
তুমি একধারে মিলাইলে।
(পিতা মাতা হয়ে)

পিতা মাতা রূপে যুগল মূরতি পুরুষে প্রকৃতির মিলন, সন্তানের ভোগ্য ও বর্ণনীয় বিষয়ই বটে। কিন্তু রসতরঙ্গভয়ে নববিধান সঙ্গীতের বিকট রসোদ্গার ভঙ্গ হয় না। তাই বৃন্দাবনের যুগল লীলার পরই গায়ক গাহিতেছেন—

তুমি পিতা হয়ে ন্যায় দণ্ড দিলে,
আবার মাতা হয়ে কোলে নিলে।

আবার মাতৃপ্রেমে বিহ্বল হইয়াই কি হঠাৎ মান ভঞ্জনের পালার সুর ভাঁজিয়া গাহিতেছেন—

দেহি পদ পল্লবং যোগিজন দুর্লভং,
হে প্রাণং বল্লভ শরণ্য।
ত্বং হি মম জীবনং ত্বং হি মম ভূষণং,
ত্বং হি মম ভরসা কেবলম্॥
(৫২১ সং ১২৩ পৃঃ)

আধ্যাত্মিক অজীর্ণ রোগের এতদপেক্ষা অধিকতর দৃষ্টান্ত অল্পই পাওয়া যাইবে। আর একটী সঙ্গীতে আছেঃ—

চিদানন্দ সিন্ধুনীরে প্রেমানন্দের লহরী।
মহাভাব রসলীলা কি মাধুরী মরি মরি॥
বিবিধ বিলাস রস প্রসঙ্গ,
শত অভিনব ভাব তরঙ্গ,
ডুবিছে উঠিছে করিছে রঙ্গ

নবীন নবীন রূপ ধরি।
(হরি হরি হরি বলে)
মহাযোগে সমুদয় একাকার হইল,
দেশকাল ব্যবধান ভেদাভেদ ঘুচিল,
(আশা পূরিল রে ॥ ..
আমার সকল মিটে গেল।)
এখন আনন্দে মাতিয়া, দুবাহু
তুলিয়া, বল রে মন হরি হরি।

এইটুকু পর্য্যন্ত একেবারে গায়কের মনের ভব যেন বুঝা গেল। সচ্চিদানন্দ সাগরে প্রেমানন্দ লহরীর নৃত্য দেখিয়া, সেই তরঙ্গ রঙ্গে বিশ্বভুবনকে একাকার ও ভেদাভেদ-বিহীন দেখিয়া তাহার প্রাণের সাধ পূর্ণ হইল ও তিনি আনন্দে নাচিতে নাচিতে, হরিগুণ গান করিতে লাগিলেন এতটা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারিলাম। কিন্তু ইহার পরেই, সঙ্গীতের উত্তরার্দ্ধে, অজীর্ণ ভাবের উৎকট ঢক্কারে সমুদায় তাল মান ভাঙ্গিয়া একাকার করিয়া দিয়াছে। অথবা আপন মনকে হরি হরি বলাইতে বলাইতে ভাবুক মহাশয়ের মনে রাইকিশোরীর কথাই বুঝি বা জাগিয়া উঠিল,—তাই গাহিতেছেন :—

টুটল ভরম ভীতি, ধরম করম নীতি,
দূরে গেল জাতিকুল মান,
কাঁহা হাম কাঁহা হরি, প্রাণ মন চুরি করি,
বঁধুয়া করিলা পয়ান।
(আমি কেনই বা এলাম রে,—
প্রেম সিন্ধু তটে।)

প্রেমসিন্ধুর তরঙ্গাভিঘাতে ভরম ভীতি, করম নীতি, জাতিকুলমান আদিতেও বা পারে। কিন্তু সেই তরঙ্গে ঝাঁপ দিয়া প্রাণ বঁধুয়া প্রাণত্যাগ করেন, বোধ হয় এ কথা এই প্রথম শোনা গেল। কিন্তু প্রাণ বঁধুয়ার অন্তর্দ্ধানেও প্রেমিকের ভাবের বেগ একটুকুও কমে নাই, বরং বাড়িয়াই উঠিয়াছে—তাই তিনি গাহিতেছেন :—

"ভাবেতে হওল ভোর, অবহি হৃদয় মোর,
নাহি যাত আপনা পসানা।
প্রেমদাস কহে হাসি, শুন সাধু জগবাসী,
এযসাহি নূতন বিধান॥"

প্রেমসিন্ধুনীরে প্রাণ বঁধুয়ার অন্তর্দ্ধান, তাহাতে প্রেমদাসের ভাবে বিভোর হইয়া আপনাকে চিনিতে না পারা ও সর্ব্বশেষে তাই দেখিয়া হাসিয়া আটখানা হওয়া, বিধানটা যে নিতান্ত নূতন তাব কি আর ভুল আছে? তবে ইহাতে পুরাতন পাপীদের মনে রঙ্গালয়ের সাজঘরের পুরাতন বিধানটাও বা মনে পড়িতে পারে।

ফলতঃ ভাবের অব্যক্ততা ও ভাষার ব্যভিচার স্থানে স্থানে নববিধান সঙ্গীতে এত বেশী যে তাহার সকল গুলির যথাযথ সমালোচনা করিলে প্রবন্ধ বাড়িয়া যাইবে। আর একটি মাত্র উদাহরণ দিয়াই শেষ করিব। ৫৫৮ সংখ্যক সঙ্গীতে আছে :—

নব রসের রসিক, চতুর প্রেমিক,
তুমি হে গোঁসাই।
তোমার মতন মজার লোক আর
দেখিতে না পাই॥
(ওহে ঠাকুর!)

এই দুই চরণ শুনিয়া আপনারা হয় ত ভাবিতেছেন, এ সঙ্গীতে মধুর বা সখ্য

রসের অবতারণা করা হইয়াছে। কিন্তু নববিধান সাধারণ লোকের ভাবের বিধান মানিতে রাজি নহেন। তাই নব রসের রসিক, চতুর প্রেমিক বলিয়া আরম্ভ করিয়া, শেষে বলিতেছেন :—

"এত রঙ্গ তুমি জান, দেখে হলাম হতজ্ঞান,
ছেলের সঙ্গে লুকোচুরি খেলিছ সদাই ;—

পিতৃসম্বন্ধে নব রসের রসিক, চতুর প্রেমিক প্রভৃতি শব্দ প্রযোগ নিতান্ত খেলেনা বালকেরই কার্য্য। কিন্তু কার্য্যাকার্য্য জ্ঞান থাকিলে বিধানটা এতটা নূতন হইয়া উঠিতে পারিত কি না সন্দেহের কথা।

নববিধান সঙ্গীতের গুণ অনেক আছে বলিয়াই তাহার দোষের এমন তীব্র কঠোর সমালোচনা করিলাম। যে সকল সঙ্গীতে ভাষার ব্যভিচার, ভাবের অরাজকতা, রসের বিকটতা, প্রভৃতি বিশেষ প্রকাশিত সে গুলিকে ভবিষ্য সংস্করণে বর্জ্জন করিলে নববিধান সঙ্গীত ব্রহ্মসঙ্গীত মধ্যে শ্রেষ্ঠতম স্থান অধিকার করিবে। আর নববিধান সঙ্গীতের গুণ বেশী বলিয়াই দোষ ভাগও চক্ষে বড় লাগে। ফলতঃ এই সকল দোষ অত্যন্ত অপ্রীতিকর ও স্থানে স্থানে তাহা দ্বারা ধর্ম্ম জীবনের অনিষ্টপাতের আশঙ্কা থাকিলেও, তাহা তাহার গুণ ভাগ মধ্যে।

নিমজ্জতীন্দোঃ কিরণেষ্বিবাঙ্কঃ।

রামমোহন রায়ের সময়ের সঙ্গীতের সঙ্গে আদি ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতের যে সম্বন্ধ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের সঙ্গীতের সঙ্গেও নববিধান সঙ্গীতের সেইরূপ সম্বন্ধ। রামমোহন রায়ের সময়ে শুদ্ধ সত্তা মাত্র জ্ঞেয় ব্রহ্ম, আদি সমাজে, সাধকের ভাবাঙ্গ অবলম্বনে জ্ঞানময় জ্যোতিঃ, আনন্দময় অব্যক্ত পুরুষ হইয়াছিলেন। ভারতবর্ষীয় সমাজে সেই অব্যক্ত সচ্চিদানন্দ দেবতাই, সাধকের ভাব অবলম্বনে, আপনিও ভাব দেহ ধারণ করিতে আরম্ভ করিয়াছেন, ইহা আমরা দেখিয়াছি। ব্রহ্মের এই ভাবাঙ্গ ধারণ প্রথমতঃ নানা প্রকারের জাগতিক সম্বন্ধের মধ্য দিয়া সেই সকল সম্বন্ধের আকারেই হয়। ভারতবর্ষীয় সমাজেই তাহার সূচনা হইয়াছিল। নববিধান সঙ্গীতে, ব্রহ্মসত্তার এই ভাবাঙ্গ ধারণ আরো পরিস্ফুট হইয়াছে। আদি ব্রহ্মসমাজ ঈশ্বরকে "জননী সমান" বলিয়াছিলেন।

"জননী সমান করেন পালন ইত্যাদি।"

ভারতবর্ষীয় সমাজ তাঁকে সাক্ষাৎ ভাবেই, জননী বলিয়া সম্বোধন করিয়াছিলেন ; এবং তাঁহার কোলে আপনাকে দেখিয়াছিলেন :—

"জননীর কোলে বসি ইত্যাদি।"

আদি ব্রাহ্ম সমাজে যাহা উপমামাত্র ছিল, ভারতবর্ষীয় সমাজে তাহা সাক্ষাৎ ভাবে ভাব রূপ ধারণ করিল। নববিধানে এই ভাব ঘনীভূত হইয়া মূর্ত্তিমান হইয়া উঠিয়াছে। নববিধানে যেন পরমেশ্বর মূর্ত্তিমতী জননীরূপে সাধকের নিকটে প্রকাশিত হইয়াছেন। তাই মায়ের প্রেমের গুণকীর্ত্তন করিয়া ব্রাহ্ম গাহিতেছেন :—

"কত ভালবাস গো মা মানব সন্তানে,
মনে হ'লে প্রেমধারা বহে দু'নয়নে।
তব পদে অপরাধী, আছি আমি জন্মাবধি,

তবু চেয়ে মুখপানে প্রেমনয়নে.
ডাকিছ মধুর বচনে।
বার বার প্রেমভরে ডাকিছ গো মা ;
প্রেমবাহু প্রসারিয়ে ডাকিছ গো মা।
স্নেহে বিগলিত হয়ে, আয় আয় আয় বলে,
হাসি হাসি মুখে, আনন্দ ভরে।
ডাকিছ গো মা।"

ক্রমে মায়ের রূপ আরো যেন ঘনীভূত হইল, তখন ব্রাহ্ম কহিলেন :—

"মা জগতজননী বিশ্বজনবন্দিনী,
বিচিত্র-রূপধারিণী চৈতন্যরূপিণী।
রূপের ছটায় বিজলি চমকে,
ক'রে ঝলমল জলে চারিদিকে,
কোটিসূর্য্য প্রভা, অনুপম শোভা,
প্রতাপে বিকম্পিত ধরণী।"

আপনার ভাবাবেশ মাতৃ অঙ্গ বারম্বার দর্শন করিয়া সাধক মায়ের রূপে গুণে বাঁধা পড়িয়াছেন। তাই গাহিতেছেন :—

মা গো চিনেছি তোমায়।
পারিবে না, পারিবে না ছাড়িতে আমায়॥
মারিলেও কাঁদিব না,
কারো কাছে বলিব না,
হাসিব ধমক দিলে পড়ে রাঙ্গা পায়।
মধুর প্রকৃতি তব, অনন্ত সুধার্ণব,
নব নব বেশে প্রাণ মন ভুলায়।

আবার গাহিতেছেন :—

মার গো মার গো আমায় ওমা সন্তান
বৎসলে। (১০৮৩)

আর এক সময়ে বলিতেছেন :—

"অপরূপ নয়নেতে, হেসে হেসে কাছে এসে
ভালবেসে প্রেমাবেশে দিলে মোরে আলিঙ্গন।
ওগো মহামায়া সতী, বহুরূপা ভগবতী,
সুন্দর মূরতি হেন দেখিনি কখন
করিলে মোহিত চিত মহাভাবে বিগলিত,
প্রভাবে হৃদয় কাঁপে চমকে নয়ন।'

আবার মায়ের লীলা দেখিয়া গাহিলেন :—

মা কি তুই কুমারের মেয়ে—(১১২৮)

কিন্তু মায়ের মাতৃত্ব, মায়ের মাধুর্য্য, মায়ের সকলই সন্তানগত। সন্তান হইতে বিচ্ছিন্ন হইলে মা অদৃশ্য হইয়া যান। মায়ের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ সন্তানসঙ্গে, তাই ব্রাহ্ম মায়ের এই শ্রেষ্ঠতম এই ঘনতম, এই উজ্জ্বলতম প্রকাশ দেখিয়া গাহিয়াছেন :—

কিরূপ দেখালি জননী, ভুবনমোহিনী।
ভক্ত কোলে ভগবতী, ভক্তচিত্ত-হারিণী।
দক্ষিণে পবিত্র যিশু, পুণ্যরবি দেব শিশু,
বামে শোভে প্রেমচন্দ্র গৌরগুণমণি।
ইচ্ছা হয় প্রাণ ভরে,এইরূপে দেখি মা তোরে,
পাদপদ্ম বুকে ধরে, মত্ত হয়ে প্রেমের ঘোরে,
থাকি দিন রজনী।

ভক্তের সঙ্গে যে ভগবানের অচ্ছেদ্য নীরবচ্ছিন্ন যোগ এ ভাব নববিধান সঙ্গীতেই ব্রহ্মসঙ্গীতাবলী মধ্যে সর্ব্ব প্রথমে পরিস্ফুট হইয়াছে। বস্তুতঃ নববিধান সঙ্গীতের একটা অতি প্রধান ভাবই—

"যেখানে ভকতবৃন্দ সেইখানে ভগবান।"

দ্বিচত্বারিংশতম সাংবৎসরিক নগর-কীর্ত্তনে এই ভাবের প্রথম বিশেষ প্রকাশ দৃষ্ট হয় ;—এই কীর্ত্তিনের শেষ কলি ছিল :—

সাধনে গিয়ে প্রেমধামে,
হেরিব নয়নে পরম সুন্দর প্রেমময় নিরঞ্জনে
ও সেই অপরূপ রূপমাধুরী;

নিরখিব প্রাণ ভরি রে,
ভকতমণ্ডলীর মাঝারে।
—এবার দেখাও নাথ সে আনন্দধাম,
রাখ শ্রীপদে বেঁধে সবে প্রেমডোরে। (২৪২)

এই সময় হইতেই এইভাব ক্রমে বৃদ্ধি পাইয়া আসিয়াছে। কিন্তু সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের জন্মের পরেই,—নববিধান ঘোষণার পর হইতে—ইহার বিশেষ স্ফূর্ত্তি হইয়াছে। দ্বিতীয় ভাগ সঙ্গীতে, অর্থাৎ যে কালকে আমি নববিধানের গর্ভবাসকাল বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছি, তখনকার একটী সঙ্গীতে, ভক্তসঙ্গে ভগবানের লীলার বিশেষ উল্লেখ দৃষ্ট হয়. সে সঙ্গীতটী এই :—

পরম সুন্দর, চিন্ময় হরিরূপ নয়নরঞ্জন
নিত্য নিরাকার নিরঞ্জন।
(রূপ দেখে, ভুলিল হৃদয় মন)

*　　*　　*

প্রিয় ভক্তগণে লয়ে সঙ্গে,
হরি থাকেন লীলা রসরঙ্গে।
যুগে যুগে ঘটে ঘটে বহু অবতার,
করেন বিচিত্র লীলা বিহার। (৩৯২)

উত্তরোত্তর সঙ্গীতে এই ভাব ক্রমে ঘনীভূত ও বিকশিত হইয়া উঠিয়াছে :—

(১) ঐ দেখ প্রেমের দরবারে আনন্দের মেলা
হরিভক্ত সঙ্গে, রসরঙ্গে,
করিছেন কত খেলা। (৪০৩)

(২) মা ভকত হৃদয় বিহারিণী।
সুপুত্র সাধুগণে, লয়ে নিজনিকেতনে,
সদানন্দে আছ দিনযামিনী;
দিয়ে সবে আলিঙ্গন, করিছ শির চুম্বন,
কোলে বসাইয়ে শুনাইছ
সুমধুর বাণী [illegible]

(৩) আমার মায়ের [illegible] ছিল
তোরা কর্ দেখি কোলে
যার নবনবরূপে নানারূপে [illegible] হরে।
রূপে করে জগৎ আলো
মায়ের কোলে শোভে ভক্তদল,
গদ গদ কোমলাঙ্গ আনন্দ ভরে। (৫২৮)

অন্যত্র:—
দেখ দেখ মায়ের প্রসন্ন বদন,
ভুবন মোহন চিত্ত বিনোদন,
পদতলে দলে দলে সাধুগণ,
নাচে গায় প্রেমে হইয়ে মগন।

আর একটী সঙ্গীতে আছে :—
ভকত মোহন ভক্ত বিনোদন
ভকতচিত্ত রঞ্জন।
ভক্ত ভয়হারী, ভকতবিহারী,
ভকত বিপদ ভঞ্জন।
ভক্তজন সঙ্গে নবনবরঙ্গে
প্রেমতরঙ্গে হয়ে মগন
নব বেশে সাজি, দয়া করি আজি
দেও দেও দরশন।
তুমি ভক্তজন হৃদয়বল্লভ,
ভক্তপ্রিয় তব চরণ পল্লব,
ভকত রক্ষক, ভকত পালক
ভক্ত ত্রিপুণ্য পাবন
ভক্ত সঙ্গে করি, এস দয়াল হরি,
দীনহীন জনে করুণা বিতরি
হৃদয়ে উদয়, হও দয়াময়,
পুরাও দাসের [illegible] (৬৬৫)

ভগবানের সঙ্গে ভক্তের [illegible] যেমন ভগবানের [illegible]

মিলনের আকাঙ্ক্ষা প্রাণে সহজেই জাগিয়া উঠে। তাই নববিধানের সাধক প্রার্থনা করিতেছেন :—

দে মা মিলাইয়া ভক্ত সনে।
আর ভিন্নভাব রেখ না জীবনে।
ভক্তের পবিত্র রক্ত দিয়ে আমায় কর ভক্ত,
ভক্ত সঙ্গে মিশে এক সনে,
আমি ধন্য হই ও পদ সেবনে। (৭০৫)

ভক্তের প্রসাদ ভিন্ন ভক্তি লাভ হয় না, ইহা ভক্তিপথের পথিকের চিরদিনের অভিজ্ঞতা। তাই নববিধানের ভক্তি সাধকও পদে পদে, ভক্তিপথে চলিতে চলিতে ভক্তের প্রসাদ ভিক্ষা করিতেছেন :—

(১) প্রেমদাসের বড় সাধ মনে,
হরি বলে ভিক্ষা করে ভক্তের দোকানে;
সাধু মহাজনের পাতের খেয়ে
ঘুচাই জঠর জ্বালা। (৪০৩)

আর একটী সঙ্গীতে সাধক বলিতেছেন :—

"ডেকে লও দয়া করে আমারে, ভিতরে।
কতদিন আর পরের মত থাকব বাহিরে।
দীনহীন কাঙ্গালের বেশে,
বসে থাকিব একপাশে,
ভক্তবৃন্দের মাঝে তোমায় দেখ্‌ব প্রাণ ভরে
তব প্রেমনিকেতনে, দেখব্‌ যত সাধুগণে,
কর'ব প্রেমভিক্ষা তাঁদের চরণে ধরে।

সাধন সম্পত্তি সাধুগণের নিকট হইতে লাভ করিতে হয়, এরূপ ভাবও নববিধান সঙ্গীতে দেখিতে পাওয়া যায়, যথা :—

"না ধরিলে শাক্যের চরণ,
হবে না না হবে কভু বৈরাগ্য সাধন।
তাঁর চক্ষে বিবেক আলোকে
... ... কর বস্তু সংসার দর্শন!"

সাধুদিগকে লোকে সাধারণতঃ যে চক্ষে দেখে নববিধান তাহা হইতে ভিন্ন চক্ষে দেখিয়া থাকেন। রামমোহন রায়ের সময়ে ঈশ্বর কেবল সত্তামাত্রজ্ঞেয় ছিলেন, আদি সমাজে যদিও ঈশ্বরের প্রীতি ও উপাসনা প্রবর্তিত হইয়াছে তথাপি সেখানেও ঈশ্বর কেবল অন্তরাত্মা, প্রাণের প্রাণ, জ্ঞানময়রূপে জীবের জ্ঞানে প্রকাশিত। জ্ঞাতা-জ্ঞেয়ের ভেদ সেখানে বিশেষভাবে বিদ্যমান। ভারতবর্ষীয় সমাজে, এই দ্বৈতভাব প্রথমে আরো স্ফুটতর হইয়া তাহার প্রথম জীবনের গভীর পাপবোধের সৃষ্টি করিয়াছিল। ভারতবর্ষীয় সমাজ যত নববিধানের দিকে ফুটিয়া উঠিয়াছে, ততই এই ভাব, এই ভেদবুদ্ধি, এই দ্বৈতজ্ঞান ক্ষীণ হইতে ক্ষীণতর হইয়া আসিয়াছে। নববিধানে প্রকৃত অদ্বৈত বা দ্বৈতাদ্বৈত ভাবের প্রথম স্ফূর্ত্তি। তাই এখানে ভাগবতী লীলা পরিস্ফুট। নববিধানের *ভক্ত-যোগের গূঢ় রহস্য এইস্থানেই* প্রকাশিত।

লীলাময় ঈশ্বর দর্শনের পূর্ব্বে বিশ্বরূপের সঙ্গে পরিচয় হওয়া আবশ্যক, পূর্ব্বে বলিয়াছি। ভারতবর্ষীয় সমাজের শেষ জীবনে বিরাট মূর্ত্তি দর্শনের প্রমাণ একটু আধটু পাওয়া গিয়া থাকে। যথা :—

মন একবার হরি বল, হরি বল হরি বল।
হরি হরি হরি বলে ভবসিন্ধু পারে চল।
জলে হরি স্থলে হরি, চন্দ্রে হরি সূর্য্যে হরি,
অনলে অনিলে হরি, হরিময় এই ভূমণ্ডল।
অন্নে হরি বস্ত্রে হরি, গৃহপরিবারে হরি,
দেহ মন প্রাণে হরি হরি সকলে সম্বল।

নিশ্বাসে প্রশ্বাসে হরি, শোণিত প্রবাহে হরি,
নয়ন অঞ্জন হরি, হরি শক্তি হরি বল।
চিন্ময় অরূপ হরি, নহেন কভু দেহধারী,
চিদানন্দরূপ হরি, করেন প্রাণ শীতল।
নয়নে দেখরে হরি, রসনায় বল হরি,
হৃদয় কমলে ভজ হরিচরণ কমল। (৪০০)

আর একটী সঙ্গীতে আছে :—

"তুমি পূর্ণব্রহ্ম ভগবান। স্রষ্টা পাতা, পিতামাতা, গুরু জ্ঞানদাতা, রাজা প্রভু ধাতা, স্বামী সখা প্রাণ প্রাণ।

বেদ প্রতিপাদ্য তুরীয় মহান,
পুরাণে লীলাময় পুরুষ প্রধান,
সর্ব্বভূতে হরি নানারূপ ধরি
আছ সদা বর্ত্তমান।"

আর একটী সঙ্গীতে :—

মোহন বেশে মন করি আকর্ষণ,
বিরাজ করিছ জগতে শ্রীহরি।
জননীর বেশে মন করি আকর্ষণ,
বিরাজ করিছ জগতে শ্রীহরি।
জননীর বেশে নারী হৃদি মাঝে,
রাজরাজেশ্বর মানব সমাজে,
করিছ শাসন করুণা বিধানে,
বিবিধ মঙ্গল বিতরণ করি।
ফলরূপে মহালক্ষ্মী রূপ ধরি,
শান্তিরূপে বহে নির্ম্মলের বারি,
(তুমি) অন্নদা রূপেতে অন্নদান করি,
পালিছ জগতে বিরাট রূপ ধরি।
মহাজ্ঞান রূপে বেদাদি বেদান্তে,
পুণ্যময় রূপে সাধু পুণ্যবন্তে,
ভব কর্ণধার হ'য়ে জীবনান্তে,
জীবে তরাও দিয়ে শ্রীচরণ তরি। (১১৫৬

কিন্তু যদিও "সর্ব্বভূতে হরি, নানারূপ ধরি" সদা বর্ত্তমান আছেন, তথাপি সকল ভূতে কি তাঁর প্রকাশ সমান? সত্তার ইতর বিশেষ কুত্রাপি নাই। কিন্তু প্রকাশের কি বিভিন্নতা, শ্রেষ্ঠ নিকৃষ্ট ভেদ নাই? জড়ে যেমন, ইতর প্রাণীতে তেমনি ব্রহ্মসত্তা সমভাবে বিরাজিত; কিন্তু জড়ে তাঁর যে ইতর প্রাণীতে তদপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর, স্ফুটতর, উজ্জ্বলতর প্রকাশ। ইতর প্রাণী অপেক্ষা মানবে তাঁর প্রকাশ অপেক্ষা আরো উজ্জ্বলতর। ইহা তো সকলেই জানি, সকলেই মানি। কিন্তু সকল মানবে জ্ঞানী ও অজ্ঞানে, বালকে ও প্রৌঢ়ে, পাপী ও সাধুতে কি ব্রহ্মসত্তা সমান ভাবে পরিস্ফুট? তাতো নয়। মানবের মধ্যে ব্রহ্মসত্তা কোথাও বা ম্লান ও অদৃশ্য, কোথাও বা উজ্জ্বল ও সুপ্রকাশিত।

তাঁর শ্রেষ্ঠ প্রকাশ কোথায়? সাধু পুরুষে, ভাগবত জনে। সৃষ্টিতে যেমন স্রষ্টা সাকার, ভক্তে ভগবান সেইরূপ সাকার। তাই বিশ্বরূপ দেখিয়া, ভগবতী লীলারস আস্বাদন করিয়া, নববিধানের ব্রাহ্ম, ভক্তে ভগবানের শ্রেষ্ঠ প্রকাশ দেখিয়া গাহিতেছেন :—

নমো দেব! নমো দেব।
নমো নিরঞ্জন হরি; স্রষ্টা পাতা মঙ্গলদাতা,
তব পদ শিরে ধরি, সবে প্রণিপাত করি।
অমর সুপুত্রগণ, যোগী ঋষি তপোধন,
ঈশা মুষাজন, গৌর আদি,
শাক্য, জনক মহাজন;
তাঁদের জীবনে, চরিত দর্পণে,
তোমারে করি দরশন, বন্দি নাথ ও চরণ।

আর একটী সঙ্গীতে গাহিতেছেন :—

কেমনে সই ভক্তের অপমান।
ভক্তে বিরাজ করেন আপনি ভগবান।

কিন্তু ভক্তে ভগবানকে দেখাও কতকটা বাহিরে দেখা। আপনার মধ্যে, অভেদ-ভেদ ভগবানকে দেখাই শ্রেষ্ঠতম দেখা। ঐ স্থানেই জীব ব্রহ্মের প্রকৃত মিলন। নববিধান সঙ্গীতে এই মিলনেরও আভাস পাওয়া যায়। কিন্তু এই মিলনও ভক্তের মধ্য দিয়াই হয়। প্রথমে সাধক ভক্তের সঙ্গে একাত্ম হইয়া, সাধু ভক্তে ভগবানের যে প্রকট রূপ তাহার সঙ্গে আপনার অভিন্নতা সাধন করিয়া, পরে ভগবানের সঙ্গে একাত্মতা সাধিত হয়। তাই নববিধান সাধক প্রথমে গাহিতেছেন :—

(এবার) হরি প্রেমানন্দে জ্বলে হব খাঁটি সোণা।
আপনার রূপে আপনি মজে
করব প্রেমসাধনা।
ভক্তের পদযুগলে'
নুপুর হ'য়ে নাচব তালে,
বাজাব রুণু ঝুনু বোলে মধুর বাজনা।
সোণার বরণ গৌর অঙ্গে,
মিশে যাব প্রেম রঙ্গে,
গৌর সঙ্গে হরিনাম করব ঘোষণা। (৫৩১)

আবার গাহিতেছেন :—

তোমার রূপের ছায়া
পড়ে যার হৃদি দর্পণে।
দেখে সে যুগল রূপ অপরূপ নিজ জীবনে।
আপনি আপন স্বভাবে, এক হ'য়ে দুই ভাবে
অটীর প্রণয়ে ডুবে, থাকে সে আনন্দ মনে।
ওহে বিধি প্রজাপতি, তব পদে এই মিনতি,
কর চিরসুখী শুভ আত্মপরিণয় বন্ধনে।

পুরুষের প্রকৃতির ব্রহ্মে জ্ঞানের সম্পূর্ণ আত্মবিসর্জ্জন, আত্মবিলয়, ও এই আত্ম-বিলয় দ্বারা ব্রহ্মশক্তিময় হওয়াতেই, এই আত্মপরিণয় বন্ধনের সার্থকতা। ব্রহ্মবিদ্ ব্রহ্মৈব ভবতি। ইহাই জীবের চরম গতি। ইহাই সাধনের শেষ সিদ্ধি। এই সিদ্ধি-তত্ত্বও এই শ্রেষ্ঠতম ব্রহ্মতত্ত্ব নববিধান সঙ্গীতে প্রকাশিত। যথা :—

হরি পদ ভজে হরি পদে মজে,
হব আমি নরহরি।
আমার আমিত্ব, অসার স্বামিত্ব,
মনুষ্যত্ব পরিহরি।
হরি বোল বলে, যাব স্বর্গে চলে,
ভাগবতী তনু ধরি।
ভেদাভেদ জ্ঞান, আত্ম অভিমান,
মহাযোগে সব হবে অন্তর্ধান,
দোঁহে দোঁহাকার, মিলন বিহার,
কিবা শোভা মরি মরি।
শ্রীহরি দর্পণে রূপ নরহরি,
নিরখি আনন্দে দুনয়ন ভরি।
নিজ পদধূলি, নিজ মাথে তুলি,
লইব ভকতি করি।

জীব ব্রহ্মের এই যুগলমিলনই ব্রহ্মতত্ত্বের শেষ তত্ত্ব। জ্ঞানের যেখানে শেষ, ভক্তিরও সেইখানেই তৃপ্তি, প্রেমেরও সেই স্থানেই পরিণতি। আদর্শ সম্বন্ধে এই উন্নত ভূমি নববিধান সঙ্গীত লাভ করিয়াছে বলিয়াই, তাহা ব্রহ্ম সঙ্গীতের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান পাইবার যোগ্য।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

মহামহোপাধ্যায়

কবিরাজ ৺দ্বারকানাথ সেন।

কালের শাসন অলঙ্ঘনীয়। বিগত ১১ই ফেব্রুয়ারী দশ ঘটিকার সময় মহামহোপাধ্যায় কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহাশয় কলিকাতা গঙ্গাতীরে সজ্ঞানে দেহ ত্যাগ করিয়াছেন। এই মহোদয় ফরিদপুর জেলার অন্তর্গত খান্দারপাড়া গ্রামে ১৮৪৫ খৃঃ জন্মগ্রহণ করেন। বৈদ্য সম্প্রদায়ের মধ্যে ইহারা কুলীন বলিয়া বিশেষ সম্ভ্রান্ত, এই মহাত্মার পূর্ব্বপুরুষেরা আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসায় অত্যন্ত নিপুণ এবং সংস্কৃত ভাষায় সুপণ্ডিত ছিলেন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র প্রচারের জন্য উঁহাদের ইচ্ছাও বলবতী ছিল। গৃহে (টোল) চতুষ্পাঠী সংস্থাপন পূর্ব্বক উক্ত মহাত্মাগণ বালকদিগকে সংস্কৃত পড়াইতেন। বালকগণের আহারীয় ব্যয়ভার উঁহারা বহন করিয়া আনন্দিত হইতেন।

দ্বারকানাথের বৃদ্ধ প্রপিতামহ অভিরাম কবীন্দ্র আয়ুর্ব্বেদ ও অন্যান্য শাস্ত্রে অসাধারণ পাণ্ডিত্য লাভ করায় রাজা সীতারাম রায় তাঁহার সভায় তাঁহাকে উচ্চস্থান দিয়াছিলেন।

দ্বারকানাথ অল্প বয়সে মাতৃহীন হন। ইনি ইহার পিতার কনিষ্ঠ পুত্র। দ্বারকানাথের জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ভার্য্যা, মাতৃহীন দ্বারকানাথকে পুত্র নির্ব্বিশেষে লালন পালন করেন। দ্বারকানাথ বাল্যকালে বড়ই সরল, কষ্টসহিষ্ণু, মেধাবী, ও উদার প্রকৃতির লোক ছিলেন। বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে ইহার জ্ঞান-পিপাসা প্রবলভাবে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। দ্বারকানাথ ঢাকা জেলার অন্তর্গত বিক্রমপুরে থাকিয়া প্রথমতঃ ব্যাকরণ, সাহিত্য, এবং দর্শন শাস্ত্র অধ্যয়ন করেন, অতঃপর তিনি মুর্শিদাবাদস্থ ভারত বিখ্যাত অসাধারণ পণ্ডিত কবিরাজ শ্রেষ্ঠ স্বর্গীয় গঙ্গাধর কবিরাজের নিকট হিন্দুর চিকিৎসা শাস্ত্র, দর্শন, ব্যবস্থাশাস্ত্র, এবং উপনিষদাদি গ্রন্থ অধ্যয়ন করেন। দ্বারকানাথ প্রতিভাবলে উক্ত পণ্ডিতাগ্রগণ্য গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়ের শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য যে চিকিৎসা ব্যবসায়ে ইনি ইহার অধ্যাপক গঙ্গাধর কবিরাজ মহাশয়কেও অতিক্রম করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৭১ খৃঃ দ্বারকানাথ রাজধানী কলিকাতা নগরীতে ব্যবসার্থ আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয় সংস্থাপন করেন। ভগবানের কৃপায় তিনি অসামান্য পণ্ডিত্যে এবং অনন্য সাধারণ চিকিৎসা পটুত্বে কলিকাতার এবং মফঃস্বলস্থ উচ্চবংশীয় ও সম্ভ্রান্ত লোকের মন মুগ্ধ করিয়া ছিলেন। তিনি কেবল বঙ্গদেশে কেন, ভারতের অন্যান্য প্রদেশের আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসক গণের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান অধিকার করিয়াছিলেন। তাঁহার যশঃ মধ্যাহ্ন ভাস্করের ন্যায় চতুর্দ্দিকে বিকীর্ণ হইয়া পড়ায়, ভারতের বিভিন্ন-প্রদেশ হইতে বহু গুণগ্রাহী ছাত্র তাঁহার শিষ্যত্ব গ্রহণ করিয়াছিল। দ্বারকানাথ

উঁহাদিগকে আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র যথানিয়মে শিক্ষা প্রদান করিতেন এবং তাঁহার ভবনে স্থান দিয়া উঁহাদের আহার যোগাইতেন। ইনি ব্যবসার প্রারম্ভ হইতেই এইরূপ লোকহিতকর কার্য্য করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। অল্পকাল মধ্যেই ব্যবসায়ে সুদক্ষতার পরিচয় দেওয়ায় দ্বারকানাথ ভারতের বিভিন্ন স্থান হইতে প্রায় সর্ব্বদাই চিকিৎসার্থ আহুত হইতে লাগিলেন, এবং যেখানেই তিনি চিকিৎসার্থ উপস্থিত হইয়াছিলেন, সেইখানেই চিকিৎসা নৈপুণ্য দেখাইয়া যশের মুকুট শীরে ধারণ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

১৮৯৬ খ্রীঃ হাটওয়ার মহারাজা তাঁহাকে চিকিৎসার জন্য আহ্বান করেন। কবিরাজ মহাশয় ঐ চিকিৎসায় বিশেষ যশঃঅর্জ্জন করেন। ১৯০১ সালে মেওয়ারের সিংহাসনের ভাবী উত্তরাধিকারী যখন উৎকট রোগাক্রান্ত হয়েন, তখন মাননীয় মেওয়ার রাজ্যের মহারাণা ভারত গভর্ণমেণ্টের নিকট উঁহার চিকিৎসার জন্য ভারতের একজন সর্ব্বোৎকৃষ্ট কবিরাজ মনোনীত করিতে অনুরোধ করেন, মহামান্য গভর্ণমেণ্ট তখন কবিরাজ দ্বারকানাথ সেন মহাশয়কে ঐ কার্য্যে মনোনীত করায় মেওয়ারের রাজধানী উদয়পুরে তিনি প্রেরিত হয়েন।

দ্বারকানাথের অসাধারণ পাণ্ডিত্যের জন্য এবং চিকিৎসকের ব্যবসায় কৃতকার্য্যতার জন্য বৃটিশ গভর্ণমেণ্ট আয়ুর্ব্বেদ চিকিৎসা শাস্ত্রে অধিকতর বিশ্বাস স্থাপন করেন, এবং সুচিকিৎসক দ্বারকানাথকে মহামহোপাধ্যায় উপাধিতে ভূষিত করেন।

দ্বারকানাথ ভারতের জাতীয় মহা সমিতির কার্য্যে যোগদান করিতেন। স্বদেশী আন্দোলনের প্রারম্ভে তিনি স্বদেশী ব্রত গ্রহণ করিয়াছিলেন, এ বিষয় বিগত ২২শে ফেব্রুয়ারী তারিখের "বেঙ্গলী" যাহা বলিয়াছেন তাহা নিম্নে উদ্ধৃত হইল।

"Although he was always busy with his own profession he showed his patriotic zeal by regularly attending several sittings of the Indian National Congress both as a delegate and as a member of the reception Committee. He was Swadeshi to the core of his heart and was found to take active part in political meettings-a thing quite unprecendented amongst the Sanskrit Pandits, especially of his age."

কবিরাজ দ্বারকানাথ বহু অর্থহীন ব্যক্তিকে কপর্দ্দক গ্রহণ না করিয়া চিকিৎসা করিয়াছেন এবং ঔষধাদি বিতরণ করিয়া নিঃসম্বল লোকের পরম উপকার সাধন করিয়াছেন। ইহার অনেক আত্মীয় অনেক সময় আর্থিক সাহায্য লাভ করিয়া অনতিক্রমনীয় বিপদ হইতে পরিত্রাণ পাইয়াছিলেন।

কবিরাজ দ্বারকানাথ ব্রাহ্মণ পণ্ডিতদিগের প্রতি বিশেষ অনুরক্ত ছিলেন, এবং উঁহাদিগকে অনেক সময় অর্থাদি ও শাস্ত্রীয় আলোচনাদি দ্বারা পরিতুষ্ট করিয়াছেন,

দ্বারকানাথের প্রকৃতি বড়ই শান্ত ছিল, তিনি সহানুভাবক, কৌশলী, ও মধুরভাষী ছিলেন। তাঁহার ন্যায় উন্নত পুরুষ বাঙ্গালীর ও বাঙ্গলা দেশের গৌরবস্থল। মহাত্মা দ্বারকানাথ ৬৫ বৎসর বয়ঃকালে মানব-দেহ পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহার জীবিতাবস্থায় অনেক আত্মীয় তাহার দ্বারা অশেষ উপকৃত হইয়াছেন, দ্বারকানাথের মৃত্যুতে তাহাদের শোক অসহনীয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে, তাঁহার অভাব আমরা তীব্রভাবে অনুভব করিতেছি। ভগবান তাঁহার আত্মায় শান্তি প্রদান করুন—ইহাই আমাদের আন্তরিক প্রার্থনা।

আং সং।

স্বর্গীয় কবিবর

নবীন চন্দ্র সেন মহোদয়ের

মৃত্যুপলক্ষে লিখিত

শোকোচ্ছ্বাস।

কালছবি!

যেই তরি ধীরি ধীরি হ'ল অগ্রসর,
তুমি কর্ম্ম-সাগরের স্নেহ-বিম্বাধর;
তুলিয়ে মোহন তান, গাহি নব নব গান,
বিমোহিয়ে ভবার্ণব মধুর ঝঙ্কারে,
যাত্রী যাব দিল পাড়ি ভব পারাবারে;—

জিনিয়েরে প্রণবের কাকলী লহরী,
মোহিল যাঁহার তান স্বর্গে বিদ্যাধরী,
শুনিয়ে যাঁহার বাণী, চমকিয়ে বীণাপাণি,
স্বীয় করে ধরে বীণা মিলাইয়ে তান,
বিমোহিল জগতের অসংখ্য পরাণ;—

উথলিয়া কত ঝড়, ভীম দুর্নিবার,
উচ্ছসিয়া যশপথে কর্ম্ম পারাবার,
বিন্দুমাত্র বিচলিতে, পারে নাই যেই চিতে,
যমচক্র-নক্র রূপ করিয়ে ধারণ,
তুমিই তাঁহারে গ্রাস করিলে যখন।

হে সাধের জন্মভূমি

তোলেনা রে হৃদিতন্ত্রী মধুর ঝঙ্কার,
চলে না লিখনী আজ কি লিখিব আর
দিতে শুভ সমাচার, কাঁপে হিয়া অনিবার,
কেমনে বলিব বল তোমার সদন,
কাল চোর হেরিল মা নবীন রতন।
যে রতন এতদিন ভবের প্রাঙ্গণে,
বিতরিল তব নাম অতি সযতনে,
মধুর ঝঙ্কার যার, কাঁপাইয়ে পারাবার,
ঘোষিল মা তোর নাম মহিমার সনে,
প্রাচ্য বা প্রতীচ্য ধামে উত্তর দক্ষিণে।
দিবধামে দেবগণ ইচ্ছি সে রতন,
পাঠাইল পটু চোর তোমার সদন,
তাই সে অলক্ষে পশি, মা তোর শিয়রে বসি,
কেড়ে নিয়ে বক্ষ হ'তে অপার্থিব ধন,
করিল মা অন্ধকার তোমার ভবন।
কর তবে দেবগণ কর জয়ধ্বনি,
বাজাও মঙ্গলবাদ্য কাঁপায়ে মেদিনী,
ভবখেলা সমাপনে, নবীন বিষণ্ণ মনে,
চলিল ত্রিদিব সুখে তোমারি আহ্বানে,
মুছায়ে মা ধূলি তবে লও যথাস্থানে।
বাজে শঙ্খ, বাজে ঘণ্টা জলে দীপাবলী,
ধ্বনিছে মধুর যথা প্রণব কাকলী,
তারারত্ন শিরে পরি, গোধূলি ত্রিদশেশ্বরী,
কর-সঞ্চালনে ওই করিছে আহ্বান,
নবীন নির্ভয়ে দেখি করিছে প্রয়াণ।
খোল তবে ধর্ম্মরাজ উত্তর তোরণ,
এস পুষ্পমাল্য করে দেবাঙ্গনাগণ,
অই যে পুষ্পক চড়ে, কবিতা মুকুট শিরে,
শোভিতেছে সমুজ্জ্বল দেববিজিত ধন,
বরমাল্য তাঁরি গলে করগো অর্পণ।

লও তবে কোলে তুলি আদরের ধন,
যেথায় গড়িছ মাগো কনক আসন,
কালিদাস মধুসনে, যেথায় আপন মনে,
গাহে নীতি সুখ-গীতি মধুর ঝঙ্কারে,
বসাও মা সযতনে তথায় তাঁহারে।

আর্য্য !

কার মুখপানে হেরি হাসিবে চটল,
বিদূরিতে অন্ধকার কোথায় সম্বল ?
স্নেহ আশীষ্-কণা, তাহে যেন শত জনা,
তব পদ চিহ্ন ধ্যায়ি হ'য়ে অগ্রসর,
তোমারি যশের ধ্বজা উড়াব সত্বর।

লীলাময়ী প্রকৃতির নিগূঢ় বন্ধনে,
এতদিন চিনি নাই তোমা হেন ধনে,
বিজয়ার কোলাকুলি, হৃদয় কপাট খুলি,
যেইদিন দিনু দেব তোমা হেন ধনে,
সেইদিন চিনিলাম অমূল্যরতনে।

নিদারুণ সমাজের কঠোর বন্ধনে,
জন্মায়েছি কত ক্ষোভ দেব তব মনে,
পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘ রাশি অন্তর গগন গ্রাসি,
তুলিল তুমুল ঝড় জীবন-সাগরে,
যদিও অটল ছিলে বীণাপাণি বরে ;—

উড়ে গেল মেঘরাশি উষার হসনে,
ভাতিল নির্ম্মল রবি সমল গগনে,
ক্ষম দেব ক্ষম তবে, চির-অপরাধী ভবে,
আমরা তোমার পুত্র, তব সহোদর,
"শান্তি" "শান্তি" "শান্তি" তব হ'ক নিরন্তর।

শ্রীদেবেন্দ্রদাস চৌধুরী।

কলিকাতা

জাতীয় বিদ্যালয়ের শিল্প-প্রদর্শনীর

দ্বারোদ্‌ঘাটন উপলক্ষে

স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের রচিত।

গান।

জননি! ভারতভূমি! ঘুমায়ে থেকো না আর।
দুখনিশা অবসান, সুপ্রভাত হ'লো হের॥
যে রবি উঠি পুরবে, পশ্চিমে গেছিল ডুবে,
কালচক্রে ঘুরে এবে, নবোদিত পুনর্ব্বার।
অবিদ্যা বলিয়া যাঁরে, দিয়েছিলে সিন্ধুপারে,
সেবি সিন্ধু-পারবাসী, লভেছে প্রাসাদ যাঁর,
মর্ত্তে ভজ তাঁরে আগে, পরা বিদ্যা তবে পাবে,
তবে ত অমৃতধামে, হ'বে তব অধিকার॥
পুরব পশ্চিমে মিলে, অখণ্ড মণ্ডল খেলে,
অবিদ্যা বিদ্যার ছায়া, ছাড়া নহে কেহ কার।
তোমারই অদ্বৈতবাদ, মানিলে ঘুচে বিষাদ,
স্মরিলে সংসারসিন্ধু, সুখে সবে হ'বে পার॥

মিটিল না তৃষা।

কই কই কই মিটিল পিযাসা?
কই কই কই পূরিলরে আশা।
কেবল রহিল আক্ষেপ অন্তরে,
চিরদিন স্মরি কাঁদিবার তরে।
যে ধন কদাচ পাইবার নয়,
কেন তারে পেতে আকাঙ্ক্ষা উদয়।
কেন ভালবাসা উথলয় মনে?
কেন দরশন ঘটে তার সনে?
যার অদর্শনে জীবনে মরণ,
কেন নাহি মিলে সে হেন রতন?
বহিছে সম্মুখে স্রোত খরতরে,
অমিয়ের-ধারা ঝরিছে নিঝরে।
বিন্দুমাত্র পিয়ে হনু আত্মহারা,
ভ্রমিতেছি যেন পাগলের পারা।

মরুভূমি মাঝে ভ্রমিয়া ভ্রমিয়া,
প্রবল পিপাসা সলিল স্মরিয়া।
নাহি পাব যায় কেন তার তরে,
জাহ্নবীর ধারে অশ্রুধারা ঝরে।
হে বিধাতা। তব কেমন সুবিধি,
মুগ্ধ কর কেন দেখাইয়া নিধি?
ভালবাসা কেন মানবে দানিলে?
নিরাশয যদি ললাটে লিখিলে?
তবে কেন নাহি দিলে হে বিস্মৃতি?
ঘটাইল জ্বালা জাগাইয়া স্মৃতি।
যাবত জীবন চিতার অনলে,
জ্বলিব, পিপাসা মিটাইবে না জলে।

শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাগচি।
সম্পাদক "বঙ্গলক্ষ্মী"।

"বারুনী"

(কৃষ্ণকান্তের উইল)

আজ'ও' তোর নীলজলে, অয়ি লো বারুনি!
মিশিয়া রয়েছে সেই অতীতের স্মৃতি
নীল আকাশের ছায়া বুকে ধরি যবে
নব দূর্ব্বাদল দামে আঁটি তনুখানি,
লাল নীল, শ্বেত, পীত গোলাপী সবুজ
নানা বর্ণে সাজি' নানা কুসুম-সম্ভারে,
আপনার ভাবে ছিলি আপনি মগনা
গর্ব্বিতা কামিনী যথা—নানা অলঙ্কারে।
তীর তরুশাখে তোর বেধেছিলি বাঁধি
কোকিলের কুহুতান; যে পঞ্চম সুরে
বাঁধাছিল সীমাহারা সুনীল গগন,
শ্যাম পত্র বিমিশ্রিত, স্তরে স্তরে
শীতল সুগন্ধপূর্ণ, সোনার বরণ,
নব বিকশিত স্নিগ্ধ আমের মুকুল;
বাধা ছিল মনোরম কুসুম উদ্যান
ঝাকে ঝাঁকে, লাখে লাখে, স্তবকে স্তবকে
শ্বেত, রক্ত, নীল পীত, শত শত ফুল;
বাঁধাছিল সমসুরে সুগন্ধ তাহার
ধীর সমীরের গায, আর সেই তানে,
কুসুমিত কুঞ্জবনে, তরুছায়াতলে,
সুষমা সাগরে তোর হত সদালয়
"গোবিন্দলালের" প্রাণ—প্রতি দিবাশেষে
তোর তীর ছিল যার নন্দন-কানন।
মধুরতা কোমলতা সুর-তান-লয়
বুঝি মদনের কোন ক্রীড়াকুঞ্জ হতে
চুরী করে আনি, এক মোহিনী-আবেশে
সেজে ছিলি, সরসি লো! যেথানে যা সাজে।
তাই তোর তীরে আসি বিধবা "রোহিনী"
উদাস আকুল প্রাণে উঠিত গুমরি'!
তাই কুহুতানে তার মরমের তার
বেসুর ঝঙ্কার তুলি উঠিত বাজিয়া!
সেই শোভা, সুর তান, সামালিতে নারি
তোরি সে সোপানে বসি অভাগী "রোহিনী"
"গোবিন্দলালের" পায় ফেলেছিল সঁপি'
আপন পরাণ খানি, গোপনে গোপনে;
শেষে তোর জল তলে, চাঁদিনী নিশায়,
ঢেলে দিয়েছিল নিজ কুসুম-নির্ম্মিত
দেহ লতা খানি, হায়; ঘৃণা অভিমানে!
প্রাণলয়ে এতখেলা খেলিলি, সরসি!
তবু যেন আশা টুকু মিটিলনা তোর,
তাই পুন মন্ত্রবলে ছি ছি মায়াবিনী!
"গোবিন্দলালেরে" টানি নিজ বক্ষঃপরে,
কৌমুদী বিছান তোর জল তল হতে
বাঁচাইলি "রোহিনীরে" সোপানে আনায়ে।
শেষে ছি ছি লজ্জা আসে স্মরিতে সে কথা!
"রোহিনীর" বিম্বাধরে "গোবিন্দলালের"
মিলাইলি কতছলে রক্ত ওষ্ঠ দুটী!
তারপর তারপর কলঙ্ক কালিমা
মাখাইয়া বিধবার যোগিনী জীবনে,
নিক্ষেপিয়া কলঙ্কের মসীময় রেখা
"গোবিন্দলালের শুভ্র বিমল হৃদয়,
ভেঙ্গে দিলি "ভ্রমরের" সুখের কপাল!
আজ তাই শোভাহীনা হয়েছ বারুনী!
নাহি সে "গোবিন্দলাল" নাহি সে
"রোহিনী" ॥ ৪ ॥

শ্রীবিজয় কৃষ্ণ ঘোষ।

সুখ ও দুঃখ রহস্য।

সুখের সঙ্গে দুঃখের যে অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ রহিয়াছে—ইহা সর্ব্বদা আমাদের স্মরণ থাকিলে, ভগবানের অপূর্ব্ব-সৃষ্টি-পরিণাম এই বিশাল পৃথিবীকে আমরা সময় সময় দুঃখের আগার বলিয়া ধারণা করিতাম না। যিনি পৃথিবীস্থ সমস্ত জীব, জন্তু, লতা, ফল ও পুষ্পের ভিতর নিরবচ্ছিন্ন স্বরূপ প্রকাশ করিয়া ফুটিয়া বাহির হইতেছেন, তাঁহার ভবন যে দুঃখ পূর্ণ এ বিশ্বাস বা কল্পনা হৃদয়ে স্থান দিলেও কলুষিত হইতে হয়। যেরূপ সমীতুল্য অন্ধকারময়ী নিশীতে শ্রান্তপথিক পথ বিলম্বিত রজ্জু পরিদর্শন করিয়া সর্পভ্রমে চমকিয়া উঠে, যখন তাহার ভ্রমজ্ঞান অপনোদিত হয়, তখন আর সে পূর্ব্ববৎ বিকৃত মস্তিষ্কের পরিচয় দেয় না, প্রকৃতিস্থ হইয়া শান্ত-ভাব অবলম্বন করে, আমরাও কি তদ্রূপ অজ্ঞানাচ্ছন্ন বলিয়াই প্রত্যেক দ্রব্যের যথার্থতা বা সত্য (Reality) নির্দ্ধারণ করিতে না পারিয়া বহির্দৃষ্টিতে ইহা দুঃখময় মনে করিয়া থাকি না? আমরা যতদিন অন্তর্দৃষ্টিতে সমস্ত জিনিষের ভিতর দিয়া তাঁহার সত্ত্বা উপলব্ধি করিতে না পারিব, ততদিন আমরা নিরবচ্ছিন্ন সুখের অধিকারী হইতে পারিব না।

ইন্দ্রিয় ও মনই সুখ ও দুঃখের অধিষ্ঠান ক্ষেত্র। হিন্দু দার্শনিকেরা বলিয়া থাকেন ইন্দ্রিয় ও মন পরিশুদ্ধ ভাব সংপ্রাপ্ত না হইলে কাহারও তত্ত্বজ্ঞান উন্মেষিত হয় না, তত্ত্বজ্ঞান-হীন ব্যক্তিই প্রত্যেক দ্রব্যে ভগবানের বিভূতি বা ছায়া অবলোকন করিতে বিমুখ হইয়া বহির্দৃষ্টিতে এই পৃথিবীটাকে দুঃখ পূর্ণ বলিয়া বোধ করে। তুমি যদি প্রকৃত সুখী হইতে চাও তাহা হইলে অন্তর্চক্ষু প্রসারিত করিতে শিক্ষাকর, অন্তর্দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি কেবলমাত্র আমাদের ন্যায় নয়নপথস্থিত দ্রব্যের প্রতি ক্ষণিক দৃষ্টি করিয়াই পরিতৃপ্তি লাভ করেন না। তাঁহারা যে জিনিষটি পরিদর্শন করেন, তাহা তাহাদের প্রগাঢ় চিন্তার ও জ্ঞানের বিষয়ীভূত হইয়া থাকে। তাহাদের লক্ষ্য দৃষ্টপদার্থের অবয়বের প্রতিই কেবল সংনিবদ্ধ থাকে না, লক্ষ্য থাকে—তাহাদের কারণের উপর। এই বিশালসংসারের যত ঘটনা বা দৃশ্যাবলী তোমার মানসপটে চিত্রিত হইতেছে, যদি তুমি উহাদের সংস্পর্শে আনন্দিত বা দুঃখিত না হইয়া কারণানুসন্ধিৎসু হও, তাহা হইলে কখনই উহারা তোমার নিকট দুঃখ পূর্ণ বা অলীক বলিয়া ধারণা হইবে না; আর যদি ততদূর জ্ঞানের সীমায় তুমি উঠিয়া না থাক, তাহা হইলে অনুষ্ঠেয় কর্ম্মে ইন্দ্রিয় লালসা বিসর্জ্জন কর। ইন্দ্রিয়গণের সঙ্গে যখন বিষয়ের সংযোগ হয়, তখনই আমরা সুখ ও দুঃখের কল্পনা করিয়া থাকি। আমাদের

নয়নের সম্মুখে যখন একটা সুন্দর বিকশিত গোলাপ ফুল প্রাপ্ত হই, তখন দর্শনেন্দ্রিয় গোলাপের সৌন্দর্য্য দেখিয়া সুখানুভব করে, যদি নয়নরঞ্জন গোলাপটি দৃষ্টিপথ বহির্ভূত হয়, তখন আর তদ্রূপ সুখ উপলব্ধি করিতে পারি-না। দুঃখও এই কারণে জন্মিয়া মানব মনে চাঞ্চল্য আনয়ন করিয়া থাকে। অতএব সুখও দুঃখ বিষয়ের সংযোগে উৎপন্ন হইয়া মানবকে নানারূপ অবস্থায় চালিত করিতেছে। বিষয় অনিত্য ভাবিয়া সুখ ও দুঃখকে অনিত্য ও অস্থায়ী ভাবা কর্ত্তব্য।

সুখ ও দুঃখকে অনেকে দুইটি বিষয় বলিয়া বর্ণনা করিয়া থাকেন, আমরা কিন্তু সুখকে দুঃখ হইতে পৃথক করিয়া লইতে পারি না, যদি সুখ কোন একটা নির্দ্দিষ্ট কার্য্যের পরিণাম মাত্র সঙ্কলিত হইত, তাহা হইলে সুখপ্রিয় প্রাণীগণ একটা কার্য্য বা বস্তুকে সুখের লক্ষ্য মনে করে না কেন? তুমি হয়ত দুর্ব্বোধ্য শাস্ত্র অধ্যয়ন করিয়া জ্ঞানের ভাণ্ডার পূর্ণ করিয়া সুখী হইতেছ, আমি হয়ত তাহাকে সুখের উপকরণ মনে না করিয়া জ্যোৎস্না-ধবলিত, কারুকার্য্য খচিত সুরম্য হর্ম্মে বাস করিয়া সুখানুভব করিতেছি, তোমাকে জ্ঞানোন্মেষী-শাস্ত্রচর্চ্চার পরিবর্ত্তে যদি নয়ন-রঞ্জন অট্টালিকা প্রদান করা যায়, আর আমাকে বিলাস সুখ-পরিপূর্ণ অট্টালিকার পরিবর্ত্তে যদি তোমার ন্যায় শাস্ত্রসাগর মন্থন করিতে হয়, তাহা হইলে কি উভয়ের সুখের আদর্শ বিভিন্ন হওয়ায় উভয়েই তজ্জন্যে বিমুখ হইয়া দুঃখভোগ করিতে বাধ্য হইব না?

একটি ক্ষুৎপীপাসা-পীড়িত শীর্ণকলেবর দরিদ্রলোক মৃত্যু যাতনায় অস্থির হইয়া রাস্তার এক পার্শ্বে বিগত চেতন প্রায় পড়িয়া রহি-য়াছে। তাহাকে তুমি কয়েকদিনের নিমিত্ত জীবিকা উপযোগী তণ্ডুল সংগ্রহ করিয়া দিলে, সে হয়ত তাহাতেই অপরিমেয় সুখ লাভ করিল, কিন্তু আমাকে সেই পরিমাণে তণ্ডুল দিলে কি আমি তাহার ন্যায় সুখানুভব করিতে পারি? যখন একের যাহাতে সুখ অপরের তাহাতে সুখ জন্মে না, তখন সুখ ও দুঃখ যে দুইটি পৃথক্ বিষয় ইহা প্রমাণীত হইতে পারে না। তোমার যাহাতে সুখ আমার তাহাতে সুখ না হওয়ার কারণ কি? তুমি মনে মনে যে সুখের আদর্শ গড়িতেছ, যখন তোমার শক্তি তোমাকে সেই সুখের আদর্শের সম্মুখবর্ত্তী করে, তখন তুমি সুখী। আমার মন যে তোমার সুখের আদর্শের অনুরূপ আমার সুখের আদর্শ গড়িয়া লইবে, তাহার কিসে প্রমাণ পাইলে? একটি সভ্যজাতি যে আদর্শে সমাজের নিয়মাবলী গড়িয়া লইয়াছে, একটি অসভ্যজাতি সেইরূপ ভাবে তাহার সুখের আদর্শ গড়িয়া লইতে পারে না, অতএব উভয় শ্রেণীর লোক তুল্য সুখী হইতে পারে না। ইহা দ্বারাই বোধ হয় তুমি স্বীকার করিবে যে, সুখের ছবি হৃদয়ে অঙ্কিত করার সময় আমরা কতকগুলি অবস্থার সঙ্গে সেই অবস্থার

তুলনা করিয়া থাকি, এবং সেই অবস্থার আমা-দিগকে নীত করিতে পারিলে আমরা সুখী হইয়া থাকি। বাস্তবিক এই সুখের কল্পনার সঙ্গেই কি আমরা দুঃখের একটা ছায়া দেখিতে পাই না? যখন কল্পনানুযায়ী সুখের আদর্শে আমরা পহুঁছিতে না পারি, তখনই বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে মন-রচিত আদর্শের তুলনা করিয়া সেই অনুপাতে সুখ দুঃখ ভোগ করিয়া থাকি। অতএব সুখ ও দুঃখ দুইটি পৃথক্ জিনিষ নহে, একটি জিনিষের দুই রকম অভিব্যক্তি মাত্র।

আমরা যদি সর্ব্বদা স্মরণ রাখি যে, এমন যে নয়ন তোষণ-গোলাপ তাহাও কণ্টকবিহীন নহে,তাহা হইলে আমরা যেরূপ সুখের আদর্শই গড়িয়া লই না কেন, আমরা সেই সময়ই স্বীকার করিয়া লইতে বাধ্য হই যে, প্রত্যেক সুখকর কার্য্যের ভিতরই আনুসঙ্গিক অসুবিধা রহিয়াছে। যাহারা এই মূল বাক্যটি ভুলিয়া যান, তাহারা স্বাধীন ভাবে একটি কার্য্যে হস্ত-ক্ষেপ করিতে গিয়া তাহাতে একটু বিপদের করাল ছায়া প্রত্যক্ষ করিলেই হতাশ হইয়া বিচার শক্তিকে ধিক্কার দিয়া থাকেন। অনেক সময় আমরা বৃথা আশার ছলনে মোহিত হইয়া, যখন তাহা পূর্ণ করিতে না পারি, তখনই দুঃখানুভব করিয়া থাকি।

কোন কোন লোক এমনই লুব্ধ যে কোন একটি জিনিষ লাভের জন্য সচেষ্ট হইয়া যখন সফলকাম হয়, তখন আর সেটিকে আদরের চক্ষে না দেখিয়া অপর দ্রব্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করে, কাজেই সে পূর্ব্ব সংসিদ্ধ কার্য্যের যথার্থ ফল বা রসাস্বাদনে অসমর্থ হইয়া দুঃখিত হইয়া থাকে। ইহাদিগকে দুরাকাঙ্ক্ষ্য বলে, এই শ্রেণীর লোক কখনও স্থায়ী সুখলাভ করিয়া শান্তি অনুভব করিতে পারে না, আবার আমরা যখন আমাদের স্বাভাবিক শক্তি দ্বারা পরিচালিত হইয়া কোন কার্য্যে হস্তক্ষেপ করি এবং দুর্ভাগ্যবশতঃ যদি সেই কার্য্য হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া কর্ম্মান্তর গ্রহণ করিতে হয়, তাহা হইলে যতদিন আমরা পূর্ব্ব কর্ম্মটির অনুসরণ-সুখ বিস্মৃত না হইতে পারি, ততদিন আমরা নূতন কার্য্যটিতে সম্পূর্ণ মনঃসংযোগ করিতে পারি না। কাজেই উহার ফল খারাপ হওয়ার আমরা দুঃখিত হইয়া থাকি। কোন কোন অভিভাবক বালকদিগকে তাহা-দের প্রবৃত্তির অনুকূলে কার্য্য করিতে দেন না। উহার ফল এই হয় যে,তাহার প্রবৃত্তির অনুকূলে যে সমস্ত কার্য্য সম্পন্ন হয়, তাহার প্রতিই বিশেষ শ্রদ্ধাসম্পন্ন হওয়ায় প্রবৃত্তি বা প্রকৃতি বিরুদ্ধ কার্য্যে বিশেষরূপে মনার্পণ করিয়া অগ্র-সর হইতে পারে না।

কেহ কেহ লোকের মন্তব্যের দিকে দৃষ্টি রাখিয়া অমুষ্ঠের কার্য্যে হস্তক্ষেপ করেন। তাহারা একবার দৃষ্টি করেন না যে, সাধারণ লোকের সঙ্গে তাহার ঐ কর্ম্ম সম্বন্ধে বিশেষ কোন সম্পর্ক আছে কিনা? সর্ব্বদাই মনে রাখিও এ পৃথিবীস্থ সকল লোকই দর্শক রূপে

তোমার কার্য্য প্রত্যক্ষ করে না। অতএব সকল কর্ম্মে লোকের মন্তব্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিলে তুমি সম্ভবতঃ কর্ম্মটি নিখুঁৎভাবে সম্পন্ন করিয়া উঠিতে পারিবে না। তোমার কার্য্যের ভিত্তি যদি সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহা হইলে সাধারণ লোক যদি তোমাকে অনুধাবন করিতে না পারিয়া বৃথা তিরস্কার করে তাহা হইলেই বা ক্ষতি কি? ঐ মিথ্যা তিরস্কার তোমার বন্ধু ও আত্মীয়ের হৃদয়ে বীতস্পৃহের ভাব আনয়ন করিয়া দিতে পারে, তাহাতে দুঃখিত বা শঙ্কিত হইও না। যে কার্য্য অসত্য তাহা দ্বারা তোমাকে সাতিশয় ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হইবে কেবল সাধারণ লোকের ঘৃণা, বিদ্রূপ বা তিরস্কারের প্রতি লক্ষ্য না রাখিয়া দুর্ণামকারী ব্যক্তিদের প্রকৃতি জানিতে চেষ্টা করিও। আমরা এক শ্রেণীর লোক দেখিয়াছি তাহারা বড়ই দুর্ণাম-প্রিয়। উহাদের কথা দ্বারা যে লোকের হৃদয় কত বিক্ষত হয়, উহারা দুর্ণাম প্রচারের সময় তদ্দিকে দৃষ্টি রাখে না, অথবা উহারা পরের দুর্ণাম প্রচার করিয়া যে সব সময় তাহাদিগকে সকলের সম্মুখে খাট করিয়া সুখী হয় তাহাও নহে, উহারা পরের ছিদ্র অন্বেষণ করিয়া এবং উহা সাধারণের গোচর করিয়া একরূপ তৃপ্তি লাভ করিয়া থাকে। ঐরূপ প্রকৃতির লোকের মন্তব্য কখনই তোমার কর্ণে প্রবেশ করিতে দিও না, যাহারা পাড়া প্রতিবেশীর প্রশংসাকেই পরিশ্রমের একটা পুরস্কার বলিয়া মনে করে, তাহারা নিশ্চয়ই প্রশংসা লাভের জন্য উন্মাদগ্রস্ত। প্রকৃত সুখী হইতে হইলে প্রশংসা ও অপ্রশংসাকে তুল্য জ্ঞান করিয়া কার্য্য করিতে হইবে।' এইরূপ সাধনা যোগের অঙ্গ, ইহাতে আমিত্ব লোপ হইয়া যায়।

সর্ব্ব প্রাণীতেই ভালবাসা বিস্তার করিতে শিখিলে অনেকটা দুঃখের হস্ত হইতে অব্যাহতি লাভ করা যায়। শাক্যসিংহ, যীশুখ্রীষ্ট, চৈতন্য প্রভৃতি মহাপুরুষগণ কি শক্তিবলে অনেক লোকের হৃদয় অধিকার করিয়াছিলেন? জীবের প্রতি নিঃস্বার্থ ভালবাসাই তাঁহাদের মূলমন্ত্র ছিল, ঐ সব প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষগণ পরকে ভালবাসিতে গিয়া নিজের অস্তিত্ব বিস্মৃত হইয়া যাইতেন, নিজের অস্তিত্ব যে সময় উপলব্ধ না হইবে—আপনার সর্ব্বস্ব পরকে দিয়া তৃপ্তি লাভ করিবে—তখন তোমার হৃদয় যে মহত্ত্বের মহিমায় স্ফুরিত হইবে, সেই স্ফুরণই সুখের ছবি তোমার নয়নের সম্মুখে ধরিয়া তোমাকে অভিসিঞ্চিত করিবে। তুমি কেবল আপনাকে লইয়া ব্যস্ত থাকিলে কখনই সুখী হইতে পারিবে না। মহাপ্রাণ গারিবল্ডি অষ্ট্রিয়ার সেনাদলকে যখন সম্পূর্ণ পরাভূত করিয়া ইটালি উদ্ধার করিলেন, তখন তিনি ইচ্ছা করিলে অতুল ঐশ্বর্য্যের অধিপতি হইয়া ইটালির সম্রাট নামে পরিচিত হইতে পারিতেন। স্বদেশ প্রেমিক মহাত্মা গারিবল্ডি সেই উদ্দেশ্য হৃদয়ে পোষণ করিয়া ইটালির রক্ষার্থে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন কি? ইটালি রক্ষাই

তিনি অদৃষ্টের কর্ম্ম বোধ করিয়াছিলেন, তাঁহার সেই উচ্চসর্ব্বস্ব সুসিদ্ধ হইলে, তিনি উহা ভিক্টর ইমাছয়েলের হস্তে অর্পণ করিয়া ক্যাপ্রেরা দ্বীপে কৃষি কার্য্য দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করিতে লাগিলেন। যিনি এইরূপ ভোগ বাসনা চরিতার্থের উপকরণ প্রাপ্ত হইয়া অবলীলাক্রমে পরিত্যাগ করিতে পারেন, তাহার হৃদয়েরর আদর্শ কত বড় উচ্চ ও মহান ছিল, তাহা কল্পনা করিলেও আমাদের সঙ্কীর্ণ হৃদয় আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠে, যিনি কেবল কর্ত্তব্যের অনুরোধে কার্য্য করেন, ফলভোগে যাহার বিন্দুমাত্র লালসা নাই, তাহার হৃদয়ে সন্তোষ ও সুখ সর্ব্বদা বিরাজ করে।

কাহারও কাহারও এত অভিমান যে, সাধারণ লোক তাহাদের প্রতিভা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিল না বলিয়া দুঃখ প্রকাশ করিয়া থাকেন। যে কার্য্যের সঙ্গে সাধারণ লোকের কোন সংস্রব নাই, সে কার্য্যের পূর্ণতার জন্য সাধারণ লোক কর্ম্মকর্ত্তার প্রতিভা ও বিচার শক্তির অসাধারণত্ব উপলব্ধি করিতে চাহিবে কেন?

এই সব কারণে অনেকে সংসারটাকে দুঃখ ও যন্ত্রণার আগার মনে করিয়া নির্জ্জন শ্বাপদ সঙ্কুল অরণ্যে বাস করিয়া সুখী হইতে চাহেন। যে কারণে দুঃখের উৎপত্তি সে কারণটি যদি আমরা অবগত না হই, তাহা হইলে অরণ্যে প্রবেশ করিয়াও আমরা সুখের কুঞ্জে বিশ্রাম লাভ করিতে পারি না। পূর্ব্বেই বলিয়াছি মন ও ইন্দ্রিয়গণই সুখ ও দুঃখের অধিষ্ঠান ভূমি, তুমি অরণ্যে প্রবেশ কর, আর গৃহেই থাক, ইন্দ্রিয় ও মন তোমার অনুগামী হইবেই। কখনও সুখ ও দুঃখকে তোমার মনের উপর আধিপত্য বিস্তার করিতে দিও না। তাহা হইলে তুমি সামান্য পর্ণ কুটিরে কি বৃক্ষের ছায়ায় অথবা রাজপ্রাসাদে,—যেখানেই থাক না কেন, সুখ ও দুঃখ হইতে মুক্ত হইতে পারিবে। আর যদি কেবল সুখের অন্বেষণে ধাবিত হও, তাহা হইলে জানিও দুঃখও সেই সঙ্গে সঙ্গে ছায়ার ন্যায় তোমার পশ্চাৎগামী হইবে। কোন কোন শ্রেণীর দার্শনিক পণ্ডিতগণ বলিয়া থাকেন যে, এই পৃথিবী ক্রমান্বয় উন্নতির দিকে চলিতেছে, এমন একদিন উপস্থিত হইবে, যখন এই পৃথিবী দুঃখশূন্য হইবে। এইরূপ আশাপূর্ণ পুষ্পিতবাক্য নিতান্ত ভিত্তিহীন বলিয়া মনে হয় না।

অনেকে এই জন্য সংসারে নিরাশ হইয়া স্বর্গকে চিরসুখের আবাস ভূমি বলিয়া ধারণা বা কল্পনা করেন। এই জন্য প্রায় সকল জাতিই স্বর্গরচনা করিয়া তাহাদের গ্রন্থে নানা-ভাবে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। কিন্তু কোন জাতিই এ পর্য্যন্ত এক রকম উপাদান লইয়া ইহা সৃষ্টি করিতে অভিলাষী হয়েন নাই। যে দেশীয় লোক সুন্দর প্রাকৃত দৃশ্য লাভ করিয়াছে ও সৌন্দর্য্য এবং সুখের কল্পনায় অগ্রসর হই-

রাছে, তাহারা উহাদের সমবায়ে স্বর্গ রচনা করিয়া পরিতৃপ্তি লাভ করিয়াছে। এই জন্য দেখিতে পাই ইংরেজগণ যাহা অত্যন্ত সুন্দর ও সুখদায়ক মনে করে, তাহাদের স্বর্গ তাহারই অপর্য্যাপ্ত বিকাশ। হিন্দুগণ যতদূর সুখ ও সৌন্দর্য্যের আদর্শ গড়িয়া আনন্দানুভব করে, তাহাদের স্বর্গে তাহাই শোভা পাইতেছে। অন্যান্য জাতির স্বর্গও এইরূপ অভিলাষ পূরণ কারিণী কল্পনায় গঠিত। ইহা দ্বারাই বুঝা যাইতেছে, স্বর্গ বলিয়া কোন একটা পৃথক স্থান নাই। উহা কেবল ভোগ-সুখ-লোলুপ ব্যক্তির মনন-রচিত সুখের আলেখ্য মাত্র।

আর যদি তোমরা মনে কর যে সব দেশের মহাপুরুষগণ কর্ত্তৃক যখন স্বর্গ সৃষ্ট হইয়াছে, তখন উহার রচনায় বিভিন্ন উপাদান গৃহীত হইলেও স্বর্গ নামে একটা সুখ পূর্ণ স্থান আছে। স্বর্গের অস্তিত্ব থাকিলেও কি সেখানে চিরসুখ বিরাজ করিতে পারে? যাহা কোন স্থান ব্যাপিয়া অবস্থিতি করিতেছে, এবং অনাদি কাল হইতে সৃষ্ট নহে, তাহাই পরিবর্ত্তনশীল। স্বর্গকে একটি পৃথক স্থান ধরিলে স্বীকার করিতে হয় যে, উহা কোন এক সময় সৃষ্ট হইয়াছে, স্থান ব্যাপিয়া আছে, এবং কাহারও কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছে, অতএব ইহা পরিবর্ত্তনশীল। পরিবর্ত্তনশীল স্বর্গে চিরসুখ বিরাজ করিতে পারে না, তথায় দুঃখও বিরাজ করে।

তবে কি আমরা দুঃখের কঠোর স্পর্শ হইতে মুক্তি লাভ করিতে পারিব না? আমরা যদি সর্ব্বদা স্মরণ রাখি যে সুখের সঙ্গে দুঃখের নিত্য সম্বন্ধ, সুখের আশা করিলে দুঃখ তাহার পশ্চাৎ আসিবে, তাহা হইলে হয় ত এইরূপ প্রকৃত জ্ঞান লাভ করিয়া আমরা সুখের ছবি হৃদয়ে গড়িয়া সুখী হইতে চাহিব না। যিনি সুখ ত্যাগ করিতে পারিয়াছেন, তিনি দুঃখের সহিত কখনই পরিচিত হয়েন না। তুমি সুখের আশা ভস্মাচ্ছাদিত অনলের ন্যায় দাহকারী বলিয়া উহা উপেক্ষা কর, দুঃখ তোমার নিকট মর্ম্মপীড়া দিতে অগ্রসর হইবে না। তুমি মুক্ত হইয়া শান্তি ও স্বাধীনতা লাভ করিবে।

সহ সম্পাদক।

রাজসূয়।

ইন্দ্রপ্রস্থ খাণ্ডবারণ্যের এক অংশে স্থাপিত। এই অরণ্য বহুবিস্তৃত। ইহাতে অসংখ্য বন্য পশু ও অনার্য্যজাতির বাস। পৌরাণিক তক্ষকগণ ইহার মধ্যে বাস করিত। এই মহাবনের মধ্যস্থিত অনার্য্যগণ দস্যু-ব্যবসায়ী; সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই তাহারা নব-প্রতিষ্ঠিত ইন্দ্রপ্রস্থে আপতিত হইয়া নাগরিকগণের উপর অশেষ প্রকারে অত্যাচার করিত। আর্য্য জাতি ব্রাহ্মণের গোধন-হরণের যে বিবরণ প্রকটিত হইয়াছে; তিনি ইহাদিগের

দ্বারাই উৎপীড়িত হইয়াছিলেন। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন এই সকল অনার্য্যদিগকে দমিত না করিলে যুধিষ্ঠিরের রাজ্যে শান্তি বিরাজ করিবে না। যে রাজ্য উপলক্ষ্য করিয়া তিনি ভারতে ধর্ম্মরাজ্য সংস্থাপন করিবেন, সে রাজ্যের ভিত্তি দৃঢ় না হইলে কোন উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হইবে না, সেইজন্য তিনি যুধিষ্ঠিরের রাজ্যের দৃঢ়ীকরণে মনোনিবেশ করিলেন। তিনি দেখিলেন যে, নগরের পার্শ্বে যতদিন এরূপ একটী প্রকাণ্ড মহারণ্য থাকিবে, ততদিন রাজ্যের শান্তিরক্ষা হইবে না; সেইজন্য তিনি অগ্নিদ্বারা সেই সুবিশাল মহাবন ধ্বংস করিতে কৃতসঙ্কল্প হইলেন। তিনি যে অর্জ্জুনের সহিত এই মহাবনে মৃগয়া * করিতে গিয়াছিলেন, তাহার উদ্দেশ্য পশু হনন নহে,—অরণ্যের পরিসর ও অবস্থা পরিজ্ঞাত হওয়াই তাঁহার প্রধানতম উদ্দেশ্য। অনতিবিলম্বেই খাণ্ডবারণ্যে ভয়াবহ অগ্নি প্রজ্বলিত হইল, এবং সেই সুবিশাল বন ভস্মীভূত হইয়া মহাশ্মশানের মূর্ত্তি ধারণ করিল। সেই মহাশ্মশানে অসংখ্য প্রাণীর অন্ত্যেষ্টি সংকার সাধিত হইয়াছিল, কিন্তু অল্পদিন মধ্যেই তাহা দানব স্থাপিত ময়ের কৌশলে রমণীয় প্রাসাদপুঞ্জে সজ্জিত হইয়া অতুল শোভা ধারণ করিল। এই সমস্ত প্রাসাদপুঞ্জেই শ্রীকৃষ্ণের, ধর্ম্মরাজ্যস্থাপনের সূচনা দেখা যায়।

মহাভারতে বর্ণিত আছে যে ময়দানব অর্জ্জুনের অনুগ্রহে সেই ভয়াবহ দাবদাহ হইতে রক্ষা পাইয়াছিল; সেইজন্য প্রত্যুপকার করিবার ইচ্ছায় অর্জ্জুনের নিকট আসিয়া বলিল, "আপনি আমাকে প্রজ্বলিত হুতাশন হইতে পরিত্রাণ করিয়াছেন, অতএব আমি আপনার কি প্রত্যুপকার করিব?" অর্জ্জুন কহিলেন, "তোমার কথাতেই সমস্ত করা হইল, এক্ষণে যথাসুখে গমন কর। তুমি আমাদিগের প্রতি সর্ব্বদা প্রীত থাক এবং আমরাও তোমার প্রতি প্রীতিযুক্ত থাকি।" পুনশ্চ ময়দানবের অত্যধিক নির্ব্বন্ধাতিশয় দর্শনে তিনি স্পষ্ট বাক্যে উত্তর করিলেন, তুমি মৃত্যুমুখ হইতে মুক্ত হইয়াছ মনে করিয়া আমার প্রত্যুপকার করিতে ইচ্ছা করিতেছ, এরূপ অবস্থায় আমি তোমাকে দিয়া কোন কর্ম্ম করাইতে পারিব না।" নিষ্কাম ধর্ম্মের অবতার শ্রীকৃষ্ণের সখা অর্জ্জুন ভিন্ন অন্য কাহার মুখে এরূপ আদর্শবাক্য শুনিতে পাওয়া যায়? অর্জ্জুন প্রথমেই বলিয়াছেন, "যাহাতে আমাদের পরস্পরের প্রীতি থাকে, তাহাই বাঞ্ছনীয়।" এক্ষণে দানবের যাচঞা প্রত্যাখ্যান করিলে পাছে সেই প্রীতিভঙ্গ হয় এবং পাছে সে তাঁহাকে গর্ব্বিত মনে করে, এইজন্য পুনর্ব্বার বলিলেন, "কিন্তু তোমার সঙ্কল্প ব্যর্থ হয়, এমনও বাসনা করিনা। অতএব তুমি কৃষ্ণের কোন কর্ম্ম সম্পাদন কর, তাহা হইলেই আমার প্রত্যুপকার করা হইবে।" তদনুসারে

* ভাগবতে বর্ণিত আছে যে এই মৃগয়া ব্যাপারেই শ্রীকৃষ্ণ কালিন্দীর পাণিগ্রহণ করিয়াছিলেন। মহাভারতে এই বিবাহের কোন উল্লেখ দেখা যায় না।

ময়দানব শ্রীকৃষ্ণের নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি কতক্ষণ চিন্তা করিয়া বলিলেন "যদি তুমি আমার উপকার করিতে অভিলাষী হই য় থাক তাহাহইলে রাজা যুধিষ্ঠিরের জন্য একটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট ও অতুলনীয় সভা নির্ম্মাণ কর।" দানব পতি ময় তাহাই করিল। ময়ের এই প্রস্তাবেই সভাপর্ব্বের সূচনা এবং এই সভা নির্ম্মাণেই ভয়াবহ কুরুক্ষেত্র সংগ্রামের প্রথম তূর্য্য ধ্বনি শুনিতে পাওয়া যায়।

মহাভারতে বর্ণিত আছে মহারাজ যুধিষ্ঠিরের সভা শোভা, সৌন্দর্য্য, গৌরব ও পারিপাট্য জগতের তদানীন্তন সমস্ত রাজসভাকে অতিক্রম করিয়াছিল। অনেক দেবর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি ও ঋষি তাহা দেখিবার নিমিত্ত নিত্য আগমন করিতেন। একদা মহাত্মা নারদ তাঁহার সেই অনুপম সভাস্থলে উপস্থিত হইয়া নানা প্রকার কথোপকথনের পর বিদায় গ্রহণকালে যুধিষ্ঠিরকে পিতার প্রত্যাদেশ জানাইয়া রাজসূয় যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিতে অনুরোধ করিলেন। তিনি বলিলেন-মহদীয় রাজসূয় যজ্ঞের সম্পাদন করিলে যুধিষ্ঠির পিতার প্রীতি এবং যাগশীলদিগের উত্তম লোক ও রাজর্ষি হরিশ্চন্দ্রের সমুজ্জ্বল প্রতিভা লাভ করিতে পারিবেন। এই সকল বিষয়ের বারবার আলোচনা দ্বারা মহারাজ যুধিষ্ঠির উক্ত যজ্ঞানুষ্ঠানে অভিলাষী হইলেন এবং ভ্রাতা ও সচীবগণের সহিত পরামর্শ করিয়া নীতিজ্ঞ শ্রেষ্ঠ শ্রীকৃষ্ণকে আনিবার নিমিত্ত দ্বারকায় দূত প্রেরণ করিলেন। কৃষ্ণ সেই দূত সমভিব্যাহারে অবিলম্বে ইন্দ্রপ্রস্থে উপনীত হইলেন এবং পিতৃস্বসা ও পাণ্ডবগণ কর্তৃক যথোপযুক্তরূপে সৎকৃত হইয়া যুধিষ্ঠিরের সহিত রাজসূয় যজ্ঞ সম্বন্ধে আলোচনা করিতে আরম্ভ করিলেন। তাঁহার সেই আলোচনা অত্যব গভীর ও শিক্ষাপ্রদ, তাহার স্তরে স্তরে তদীয় উৎকৃষ্ট রাজনীতি-জ্ঞানের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া যায়, তাহর প্রত্যেক পদে ভারতের তদানীন্তন রাজন্য মণ্ডলের পূর্ণ চিত্র প্রতিফলিত হইয়াছে। সর্ব্বাগ্রে শ্রীকৃষ্ণ মগধরাজ জরাসন্ধের দুর্জ্জয় তেজ ও অপ্রতিহত প্রভাবের চিত্র তাঁহার সমক্ষে পূর্ণরূপে চিত্রিত করিয়া অবশেষে বলিলেন, "একশত রাজবংশী যদিগের মধ্যে কেহই জরাসন্ধকে প্রতিরোধ করিতে পারেন না, সুতরাং সে বল দ্বারাই সাম্রাজ্য ভোগ করিতেছে। রত্নভাজন রাজগণ রত্নদানে তাহার উপাসনা করিয়া থাকেন, ইহাতে সে সন্তুষ্ট না হইয়া মূর্খতা বশতঃ দুর্নীতি অবলম্বন পূর্ব্বক মূর্দ্ধাভিষিক্ত রাজগণকে বলদ্বারা আক্রমণ করে। এমন পুরুষই দেখা যায় না,—যাহার নিকট হইতে জরাসন্ধ বলপূর্ব্বক রাজস্বের অংশ গ্রহণ না করে। এইরূপে জরাসন্ধ প্রায় একশত রাজাকে অধীন করিয়াছে। হে ভরতনন্দন! আপনার অপেক্ষা দুর্ব্বল রাজা কি প্রকারে তাহার শত্রুতা করিবে? পশুপতি-গৃহস্থিত, পশুগণের ন্যায় প্রোক্ষিত ও বলিদানার্থ নির্দ্দিষ্ট রাজগণের জীবনে আর কি প্রীতি হইতে পারে? যাঁরে

নিহত হইলে। ক্ষত্রিয়গণ যখন সংকারভাজন হয়েন, তখন অবশ্যই আমরা সময়ে সমবেত হইয়া জরাসন্ধকে প্রতিরুদ্ধ করিব। একশত মধ্যে ষড়শীতি ভূপতি জরাসন্ধ কর্তৃক সমানীত হইয়া বলিদানার্থ নিরূপিত রহিয়াছেন, কেবল চতুর্দ্দশ মাত্র অবশিষ্ট আছেন, তাঁহারা হস্তগত হইলেই ঐ ঘোর ক্রূরকর্ম্ম অচিরে সম্পাদিত হইবে। অতএব ঐ ব্যাপারে যিনি বিঘ্ন প্রদান করিতে সমর্থ হইবেন, তিনিই প্রদীপ্ত যশোরাশি লাভ করিতে পারিবেন এবং যিনি তাহা জয় করিবেন, তিনি নিশ্চয়ই সাম্রাজ্য ভোগ করিবেন।

শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় দুইটী অভিসন্ধি পরিস্ফুট রহিয়াছে। (১) জরাসন্ধ বধ। (২) বলিদানার্থ নির্দ্দিষ্ট রাজগণের উদ্ধার। জরাসন্ধ পশুপতির সম্মুখে একশত ক্ষত্রিয় রাজাকে বলি দিতে মনস্থ করিয়া ষড়শীতি জনকে সংগ্রহ করিয়াছিল। তাঁহারা তৎকর্তৃক নিতান্ত নৃশংসভাবে পশুপতির গৃহে পশুর ন্যায় আবদ্ধ হইয়া নিত্য কঠোর মৃত্যু যন্ত্রণা ভোগ করিতেছিলেন। অবশিষ্ট চতুর্দ্দশ রাজা হস্তগত হইলেই বলিদানের আয়োজন হয়। শ্রীকৃষ্ণ দেখিলেন ইহা অপেক্ষা ঘোরতর নৃশংস কার্য্যের অনুষ্ঠান হইতে পারে না। জরাসন্ধ প্রবল প্রতাপান্বিত; কিন্তু তাহা বলিয়া কি সে অনুগত বা পরাজিত রাজগণকে পশুর ন্যায় হত্যা করিবে? যাঁহারা ভাগ্যদোষে প্রবল রাজার নিকট পরাস্ত হইয়া স্বাধীনতা হইতে বিচ্যুত হয়েন, তাঁহাদিগের কি আত্মজীবন রক্ষার উপযোগী কিছুমাত্র ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য থাকে না? জেতা নরপতিই কি তাদের জীবন-মৃত্যুর স্বামী? স্বেচ্ছাপরতামূলক এরূপ নৃশংস শাসন-প্রণালী জগতে প্রবর্ত্তিত হইলে জগৎ অচিরে পিশাচের বিলাস ভূমি হইয়া পড়িবে। যে রাজা এরূপ জঘন্য শাসন-প্রণালীর প্রবর্ত্তক সে রাজা পিশাচের রাজা। তাহাকে বধ না করিলে জগতের শান্তি কোথায়? সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ স্থির করিলেন যে, অগ্রে জরাসন্ধকে বধ করিতে হইবে, তাহার পর পশুরূপে আবদ্ধ রাজগণের উদ্ধার সাধন। এরূপ করিলে ভারত ভূমি নিষ্কণ্টক হইবে এবং অসংখ্য ক্ষত্রিয় নরপতি মহারাজ যুধিষ্ঠিরের বশ্যতা স্বীকার করিবেন। তাহা হইলে যুধিষ্ঠিরের রাজসূয় যজ্ঞ নির্ব্বিঘ্নে সাধিত হইবে এবং পরিশেষে তাঁহারাই তাঁহার সঙ্কল্পিত ধর্ম্ম রাজ্য স্থাপনের এক একটী স্তম্ভ স্বরূপ হইবেন।

বিস্তর বাদানুবাদের পর অবশেষে স্থির হইল শ্রীকৃষ্ণ ভীমার্জ্জুনকে লইয়া জরাসন্ধকে বধ করিতে যাইবেন। একে জরাসন্ধ অপ্রমেয় বলশালী, তাহাতে আবার নিজ সহায় বলের মধ্যে স্বীয় রাজধানীতে অবস্থিত, এরূপ অবস্থায় তাহার সহিত প্রকাশ্য যুদ্ধ অসম্ভব। এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ বলিলেন "আত্মছিদ্র গোপনে যত্নবান হইয়া পরের ছিদ্রানুসারে আক্রমণ করিলে কেন না আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারিব? পণ্ডিতদিগের নীতি এই যে, ন্যাসৈন্য অতি

অস্ত্রি বলিষ্ঠ শক্রর সহিত কদাচ যুদ্ধ করিবে না। ইহাতে আমিও অসম্মত নহি; কিন্তু অজ্ঞাতসারে শক্রর গৃহে প্রবেশ পূর্ব্বক তাহার দেহ আক্রমণ করিয়া অভীষ্ট লাভ করিতে পারিলে আমরা কোনক্রমে নিন্দনীয় হইব না।" শ্রীকৃষ্ণের এই কথায় কেহ কেহ মনে করিতে পারেন যে, জরাসন্ধকে গুপ্তভাবে হত্যা করাই তাঁহার প্রধান উদ্দেশ্য, কিন্তু তিনি যখন পরে বলিলেন "আমরা জ্ঞাতিগণের পরিত্রাণ-পরায়ণ হইয়া সংগ্রামে হয় তাহাকে নিহত করি, না হয় তৎকর্ত্তৃক নিহত হইয়া স্বর্গলাভ করি।" তখন শ্রীকৃষ্ণের উপর সেরূপ জঘন্য দুরভিসন্ধি আরোপিত করিতে পারা যায় না। ফলকথা শ্রীকৃষ্ণ দ্বন্দ্ব যুদ্ধে জরাসন্ধকে সংহার করিতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন এবং তাঁহার সে ইচ্ছা ফলবতী হইয়াছিল। তদানীন্তন ক্ষত্রিয় সমাজে এই নিয়ম প্রচলিত ছিল যে, কোন ক্ষত্রিয়কে কেহ দ্বৈরথ যুদ্ধে আহ্বান করিলে তিনি তাহাতে অসম্মত হইতেন না। সেইজন্য শ্রীকৃষ্ণ জরাসন্ধকে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিতে মনস্থ করিয়া কেবল ভীম ও অর্জ্জুনকে সঙ্গে লইলেন। তিন জনে যুদ্ধ বিদ্যায় পারদর্শী, দ্বৈরথ যুদ্ধে তিন জনেই জরাসন্ধের সমকক্ষ। তাঁহাদের মধ্যে জরাসন্ধ যাহাকে ইচ্ছা প্রতিযোগী রূপে রণে আহ্বান করিতে পারে। সুতরাং জরাসন্ধকে গুপ্তভাবে হত্যা করা শ্রীকৃষ্ণের উদ্দেশ্য নহে— বিশেষতঃ তাঁহারা যখন কোন অস্ত্র শস্ত্র না লইয়া স্নাতক ব্রাহ্মণ বেশে রাজগৃহে উপনীত হইয়াছিলেন, তখন তাঁহাদিগের উপর সেই কাপুরুষোচিত জঘন্য দুরভিসন্ধি কিছুতেই আরোপিত হইতে পারে না। আর এক কথা, জরাসন্ধের গুপ্ত হত্যাই যদি কৃষ্ণের অভিপ্রেত হইত, তাহা হইলে তাঁহারা কখন ভেরি ভগ্ন ও চৈত্য চূর্ণ করিয়া প্রকাশ্যভাবে শক্রগৃহে প্রবেশ করিতেন না। তবে এ বিষয়ে তিনি কতকটা কূটনীতির আশ্রয় লইয়াছিলেন। তিনি জানিতেন জরাসন্ধ ব্রহ্মার বলে যাদবগণের অবধ্য, সুতরাং তিনি তাহাকে বধ করিতে পারিবেন না। যদুকুলের অবধ্য না হইলে জরাসন্ধ অষ্টাদশ বার মথুরা আক্রমণ করিতে পারিত কি না সন্দেহ; অধুনা সেই কারণেই তিনি ভীম ও অর্জ্জুনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। তাঁহার দৃঢ় ধারণা এই যে, জরাসন্ধ ভীমকে পাইলে কখন অর্জ্জুন কিম্বা তাঁহার সহিত যুদ্ধ করিতে চাহিবে না। অপিচ তাঁহারা তিন জনেই স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়া জরাসন্ধের পুরীমধ্যে প্রবেশ করিলেন। জরাসন্ধের এই একটী দৃঢ় ব্রত ছিল যে, স্নাতক ব্রাহ্মণেরা অর্দ্ধ রাত্রেও তাহার ভবনে উপস্থিত হইলে সে তাঁহাদের সহিত সাক্ষাৎ করিত; বোধ হয় এই জন্য শ্রীকৃষ্ণ ও ভীমার্জ্জুন স্নাতক ব্রাহ্মণের বেশ ধারণ করিয়াছিলেন। ইঁহারা জরাসন্ধের নিকট উপস্থিত হইলে মগধরাজ তখনই গাত্রোত্থান করিয়া "আপনাদের শুভাগমন হউক" বলিয়া সাদর সম্ভাষণ পূর্ব্বক পাদ্যাদি দানে তাঁহাদের যথা-

বিহিত সংস্কার' কারণ। তৎকালে ভীম ও অর্জুন মৌনভাবে' রহিলেন, এবং মহাবুদ্ধি কৃষ্ণ জরাসন্ধকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন 'ইহারা নিয়মস্থ আছেন, এজন্য এক্ষণে কথা কহিবেন না, অর্দ্ধরাত্রি অতীত হইলে তোমার সহিত আলাপ করিবেন।" এইরূপ নীতি অবলম্বন করিবার উদ্দেশ্য কি, তাহা বলিতে পারা যায় না। কেহ কেহ বলেন সুদূর পথ অতিক্রম পূর্ব্বক শত্রুগৃহে প্রবেশ করিয়াই আপনাদিগকে শত্রু বলিয়া পরিচিত করা নিতান্ত অজ্ঞানের কার্য্য; তাঁহারা নিশ্চয়ই শ্রান্ত, সেরূপ অবস্থায় জরাসন্ধ তাঁহাদের পরিচয় পাইলে হয়ত অশ্রদ্ধা করিতে পারে; অথবা অবিলম্বেই যুদ্ধ করিতে পারে; তাহা হইলে উৎকট শ্রান্তি বশতঃ হঠাৎ পরাজিত হইবার সম্ভাবনা। এইজন্যই শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে মৌনব্রত অবলম্বন করিতে বলিয়া অর্দ্ধরাত্রি পর্য্যন্ত সময় লইয়াছিলেন। বাস্তবিক, বিশেষ বিবেচনা করিয়া দেখিলে এরূপ উদ্দেশ্য অন্যায় বলিয়া আরোপিত হইতে পারে না।

অনন্তর, জরাসন্ধ নিশীথ কালে "তাঁহাদের সহিত পুনর্ব্বার সাক্ষাৎ করিয়া পরিচয় জিজ্ঞাসা করিল। তাঁহাদের আকার ইঙ্গিত ও বেশভূষা দর্শনে তাহার মনে বিষম সন্দেহ হইয়াছিল; সেই জন্য তাঁহাদিগের নিকট আসিয়াই কহিল, "আমি জানি স্নাতক ব্রতধারী ব্রাহ্মণেরা গৃহস্থ আশ্রম প্রবেশ ব্যতীত অন্য কোন সময়েই মাল্যাদি ধারণ করেন না; কিন্তু দেখিতেছি তোমরা পুষ্প ধারণ করিয়াছ, অধিকন্তু তোমাদের ভুজতলে জ্যাঘাত চিহ্ন রহিয়াছে; অতএব তোমরা কে? তোমাদের দেহে ক্ষত্রিয়তেজ স্ফুরিত হইতেছে, কিন্তু তোমরা ব্রাহ্মণ বলিয়া পরিচয় দিতেছ।"

শ্রীকৃষ্ণ কৌশলে এই সকল কথার প্রত্যুত্তর দিলেন এবং দুই তিনটী প্রশ্নের পর জরাসন্ধের অত্যাচার কাহিনী তীব্র ভাষায় বর্ণিত করিয়া অবশেষে বলিলেন, "আমরা বাস্তবিক ব্রাহ্মণ নহি, কেবল ছলনা দ্বারা তোমাকে নিহত করিবার নিমিত্ত ব্রাহ্মণ বেশ ধারণ করিয়াছি। আমি হৃষীকেশ কৃষ্ণ, আর এই দুই বীরপুরুষ পাণ্ডুরাজের পুত্র। আমরা তোমাকে আহ্বান করিতেছি; স্থির হইয়া যুদ্ধ কর। হয় সমুদয় নৃপতিগণকে মুক্ত করিয়া দাও, না হয় শমন ভবনে গমন কর।" কৃষ্ণের এই শেষ কথার আলোচনা করিয়া স্পষ্ট বুঝা যায় যে, কারাবদ্ধ রাজগণের উদ্ধার সাধনই জরাসন্ধ-বধের প্রধানতম উদ্দেশ্য। জরাসন্ধ বিনাযুদ্ধে তাঁহাদিগকে মুক্ত করিলে কৃষ্ণ কর্ত্তৃক যুদ্ধে আহূত হইত কি না বলা যায় না। যাহা হউক, জরাসন্ধ যুদ্ধে সম্মত হইয়া স্বীয় পুত্র সহদেবকে রাজ্যে অভিষিক্ত করিয়া এবং যশস্বী ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক কৃতস্বস্ত্যয়ন হইয়া ক্ষত্রিয় ধর্ম্ম স্মরণ পূর্ব্বক যুদ্ধার্থে সজ্জিত হইল। তাহার পুরোহিত গোরোচনা, মাল্য ও অন্যান্য মাঙ্গলিক দ্রব্যসম্ভার এবং বেদনা-নিবারক ও চৈতন্য-

সম্পাদক উত্তম উত্তম ঔষধ সকল লইয়া তথায় উপস্থিত রহিলেন। শ্রীকৃষ্ণ জিজ্ঞাসা করিলেন "আমাদিগের তিন জনের মধ্যে কাহার সহিত তোমার যুদ্ধ করিতে অভিলাষ হয়?" জরাসন্ধ ভীমের সহিত যুদ্ধ করিতে ইচ্ছা করিল। তখন সমবেত পৌর ও জানপদবর্গের সম্মুখে ভীম ও জরাসন্ধে ভীষণ বাহুযুদ্ধ আরম্ভ হইল। কার্ত্তিক মাসের প্রথম দিবসে যুদ্ধ আরম্ভ হয়; সেই দিন হইতে ক্রমাগত ত্রয়োদশ দিবারাত্রি উভয়ে অনাহারে অবিশ্রান্ত যুদ্ধ করিলেন; চতুর্দ্দশী রাত্রিতে জরাসন্ধ শ্রান্ত হইয়া পড়িল। তখন শ্রীকৃষ্ণ ভীমকে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন, "তোমার যে পরম দৈববল আছে এবং পবন হইতে তুমি যে বল লাভ করিয়াছ, অদ্য জরাসন্ধের প্রতি শীঘ্র তাহা প্রয়োগ কর।" তখনই ভীমসেন জরাসন্ধকে ঊর্দ্ধে উত্তোলন করিয়া ভ্রামিত করিতে লাগিলেন; তাহার পরে স্বীয় জানুদ্বারা তদীয় পৃষ্ঠদেশ নমিত করিয়া ভগ্ন করিয়া ফেলিলেন, তাহাতেই জরাসন্ধের প্রাণবিয়োগ হইল।

অনন্তর শ্রীকৃষ্ণ সেই কারাবদ্ধ রাজগণের মোচন করিয়া তাহাদিগের সহিত গিরিব্রজ হইতে বহির্গমন পূর্ব্বক কোন সমতল ক্ষেত্রে কিয়ৎক্ষণ বিশ্রাম করিলেন। তথায় নগরবাসী ব্রাহ্মণ ও অন্যান্য জনগণ বিধিবিহিত কর্ম্ম দ্বারা তাঁহার সংকার করিলেন; বন্ধনবিমুক্ত ভূপালগণও তাঁহাকে পূজা করিয়া কহিলেন, "আমরা জরাসন্ধের অত্যাচারে নিরতিশয় নিপীড়িত হইয়া ভয়াবহ গিরিদুর্গে নিতান্ত অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছিলাম, আপনি আমাদিগকে মুক্ত করিয়া ধর্ম্ম প্রতিপালন করিলেন। আমরা একান্ত প্রণত হইয়াছি, এক্ষণে কি করিব, আজ্ঞা করুন। আপনি যে কর্ম্ম করিতে আদেশ করিবেন, তাহা নিতান্ত দুষ্কর হইলেও আমরা তাহা সম্পাদিত করিব।"

শ্রীকৃষ্ণ তাঁহাদিগকে আশ্বাস প্রদান পূর্ব্বক কহিলেন, "ভূপালগণ! যুধিষ্ঠির রাজসূয় যজ্ঞ করিতে অভিলাষী হইয়াছেন, আপনারা তাঁহার সাহায্য করুন।" তাঁহারা "তাহাই করিব" বলিয়া সুপ্রীতমনে ও সবিনয়ে তাঁহার অনুরোধ শিরোধার্য্য করিলেন। অতঃপর শরণাগত জরাসন্ধ নন্দন সহদেবকে মগধের সিংহাসনে অভিষিক্ত করিয়া কৃষ্ণ পাণ্ডবদ্বয়ের সহিত ইন্দ্রপ্রস্থ উপস্থিত হইলেন।

ক্রমশঃ।

শ্রীযজ্ঞেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় কবিভূষণ।

মনের পাখী।

—০:-:০—

(১)

ওরে আমার মনের পাখী,
মনের পাখী মোর!
কি যে রে তোর করুণ আঁখি,
পাগল করা মোর!
থাক্‌তিস তুই কোন সে বনে,
ছায়ার বুকে নীড়ের কোণে,
কোন্ আকাশ, কোন্ বাতাস,
ছিলরে সাথী তোর!
কোন ফলেতে পূরত আশা,
কোন জলেতে মিটত তৃষা,
কার কোলেতে কাটিত নিশা,
জাগ্‌তি' হলে ভোর!
ওরে আমার মনের পাখী,
মনের পাখী মোর!

(২)

কখন তুই আপনি এসে
দিলি আমায় ধরা,—
সকল ধরা উঠল হেসে
সে দিন মনোহরা।
আমার মরা গানের বুকে
সেদিন বান ডাক্‌ল সুখে
দু'কূলে তার সুধার ধার
ছুট্‌ল অতি ত্বরা!
যত শুক্‌নো তরু লতায়
নূতন তব চারু শোভায়
উঠ্‌ল সেজে পাতে শাখায়
দিলি আমায় ধরা!

(৩)

নিমেষ হেন কত বরষ
কোথায় গেল চলি,—
বিতরি তুই শুধু হরষ
আছিস্ কুতুহলি!
কি যে রে তুই গাহিস্ গান
আকুল করে সারাটী প্রাণ
মনের মোর গোপন তর
সুরটী কোথা পেলি!
কে কয় তোরে এমন করে
ডাক্‌তে নিশি-দিবস ধরে
আমারি নাম হাজার স্বরে
কেবলি যায় চলি।

(৪)

ওরে আমার মনের পাখী,
মনের পাখী মোর ;
পালাবি তুই কোথায় আর
কোথায় ঠাঁই তোর !
এ যে বড়ই কঠিন খাঁচা
টুট্‌তে তুই চাহিস্ মিছা
ভালবাসার সোনার হার
চির মিলন তোর !

হিয়ায় মোর গোপন মধু
তোরই তরে রেখেছি শুধু,
উড়তে তবু নিঠুর বঁধু,
করিস্ কেন জোর !
ওরে মনের পাখী আমার,
মনের পাখী মোর !

শ্রীজীবেন্দ্রকুমার দত্ত বি, এ।

প্রেম।

—০:০—

প্রেম নহে শুধু পার্থিব বাসনা,
প্রেম পুণ্যময় নিঃস্বার্থ সাধনা ;
প্রেম নহে কভু আঁখির ছলনা,
মনের মিলন প্রেম আরাধনা।
প্রকৃত প্রেমিক প্রণয়ের তরে
জগতে সকল ভুলিবারে পারে,
রাজসিংহাসনে, গহন কাননে,
প্রেমিক প্রেমিকা থাকে যেই খানে,
সেই স্বর্গধাম নন্দন কানন ;
কি আছে কোথায় সুখের এমন ?
হোক না সে স্থান নীরব নির্জ্জন,
হোক না সে স্থান ভীষণ দর্শন,
কিন্তু যদি কেহ মনের মতন
থাকে সেথা সাথী প্রাণের রতন,
হেন সুখকর শান্তির আগার
রমণীয় স্থান কোথা আছে আর ?
বসন্ত সেথায় চির সহচব,
ফুল দল মাঝে বিরাজে ভ্রমর,
মৃদুদল মলয় পবন হিল্লোলে
পুলকিত করে প্রেমিক যুগলে।
প্রেমিকের প্রাণে যত সুখ আছে,
ধনরত্ন ভোগ তুচ্ছ তার কাছে,
প্রেমে সুখ শান্তি, প্রেমে স্বর্গ জয়,
পুণ্য প্রেমে এই বিশ্ব প্রেমময়।

শ্রীমাখনলাল গঙ্গোপাধ্যায়।

জীবনবেদ-পাঠ।

—•:•:•—

ভারতের পশ্চিমপ্রান্তে পূতসলিল পঞ্চনদ-তীরে বেদপাঠ আরম্ভ হইয়াছিল। বেদ-শাস্ত্র বেদ-মন্ত্র এবং বেদ-জ্ঞানই ধর্ম্ম-জ্ঞানরূপে গৃহীত হইয়াছিল। বেদ-মহিমায় ভারতবর্ষ মহিমান্বিত হইয়াছিল। যাঁহারা বেদপাঠের অধিকার গ্রহণ করিলেন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ—ভূদেব—ঋষিপদে বরিত হইয়া ব্রাহ্মণেতর জাতির পূজা প্রাপ্ত হইতে লাগিলেন। সহস্র সহস্র বৎসর পরে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারক ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন ভারতের পূর্ব্বপ্রান্তে হিন্দু-কুল-পূজিতা ভাগীরথী-তীরে দণ্ডায়মান হইয়া অনুপ্রাণিত হৃদয়ে, ওজস্বিনী ভাষায় এই মর্ম্মে বলিয়া উঠিলেন —"প্রত্যেক মানব-হৃদয় এক এক খানি বেদ।" "সকল গ্রন্থ অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ গ্রন্থ জীবন। "সকল বস্তু অপেক্ষা আদরনীয় আপনার জীবন।" "হে মানব! স্বীয় জীবন-বেদ পাঠ কর।" কেশবচন্দ্র কি গভীর তত্ত্ব-কথা প্রকাশ করিলেন। জগৎ-বাসী শ্রবণ করিল, প্রত্যেকেরই জীবনবেদপাঠের অধিকার আছে। এ রাজ্যে ব্রাহ্মণ এবং ব্রাহ্মণেতর বলিয়া কোন সীমা নাই, পার্থক্য নাই। এ পাঠ হইতে কেহই বঞ্চিত নহে। পণ্ডিত,মূর্খ সকলেই এ বেদ পাঠ করিবার সমান অধিকারী। পরমেশ্বরের কি অপূর্ব্ব দান—জীবনবেদ।

এ বেদ পাঠ করাইবার অধিকারী কে? স্বয়ং প্রভু পরমেশ্বর। তিনি তাঁহার সন্তানদিগকে ত্রিবিধ বিষয়ে বেদপাঠ করাইতেছেন। জীবনমন্দিরে প্রবেশ লাভ করিয়া দেখিতে পাই, সেই সত্যম জ্ঞানমনন্তম্ ব্রহ্ম-প্রকৃতি বেদগান করিতেছেন। তাঁহার মুখে প্রকৃতি বেদ-সঙ্গীত শ্রবণ করিয়া আত্মা মোহিত এবং নব ভাবে, নব শিক্ষায় নব রসে আপ্লুত হইয়া উঠে। কবি নির্ঝরিণীর মুখে কুলু কুলু ধ্বনি শ্রবণ করিতেছিলেন; বিহঙ্গের অমিয় কণ্ঠে সঙ্গীত-তান শ্রবণ করিতেছিলেন; আকাশ, দীপ্তি, সুনীল জলধি, অভ্রভেদী পর্ব্বত-মালা, বনস্পতি, সুশ্যামল শস্যক্ষেত্র মধ্যে অপূর্ব্ব রূপ-ভাতি নিরীক্ষণ করিয়া তন্ময় হইতেছিলেন; কিন্তু কবির প্রাণ-মন্দিরে যখন ভগবান বেদ-শিক্ষাদাতারূপে আবির্ভূত হইলেন, তখন কবি কাব্যকুঞ্জ হইতে ভক্তি-জলধিতে অবতরণ করিলেন। তখন আর তিনি বলেন না —"বল্ দেখিরে তরুলতা, আমার জগজ্জীবন আছে কোথা, তোরা পেয়ে বুঝি কস্‌নে কথা, তাই তোদের কুসুম হাসে।" "বল্ দেখিরে হিমাচল, তুই কিসে এত সুশীতল, ঝরিতেছে অশ্রুজল, কার অনুরাগে মিশে।" তখন কবি কবিত্ব-জীবন পরিহার করিয়া ভক্ত-জীবন লাভ করি-

য়াছেন। তখন প্রভুর কাছে তিনি প্রকৃতি-বেদ পাঠ করিতেছেন। তখন তিনি ভক্তি-কোমলকণ্ঠে অমৃত-গাথা গাহিতে থাকেন। তখন তিনি পাঠ করেন ---

"পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা
রেখা নয়, তোমার দয়াল নামটী লেখা
সুন্দর নামে নামাঙ্কিত পাখীর পাখা,
প্রেমানন্দ নাম নয়নে লিখেছ।
চন্দ্রাতপ তুল্য গগন মণ্ডল,
দীপালোকে যেন করে ঝলমল,
তার মাঝে ইন্দু ঝরে সুধাবিন্দু,
সুধাসিন্ধু নাম তায় অঙ্কিত করেছ।"

"কে রচে এমন সুন্দর বিশ্ব ছবি, রতন মণি-খচিত অম্বর কি শোভে," ইহা কবির উক্তি; কিন্তু "তোমার মধুররূপে ভরেছে ভুবন, মুগ্ধ নয়ন মম মোহিত মন," ইহা প্রকৃতি-বেদ-পাঠক ভক্তের উক্তি। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবনে দেখিতে পাই, তিনি বিশ্বাধীপের চরণ-তলে বসিয়া প্রকৃতি-বেদ পাঠ করিতে করিতে তন্ময় হইয়া, স্বরূপ-সাগরে ডুবিয়া, ব্রহ্ম-সম্ভোগে কাল যাপন করিয়াছিলেন। তিনি যমুনার কল্লোলে, হিমারণ্যের নীরব সৌন্দর্য্যে, অনন্ত আকাশের সুনীল পটে পরব্রহ্মের হস্তাক্ষর দেখিতে পাইয়া উচ্চৈঃস্বরে পাঠ করিয়াছিলেন। সেই মহামন্ত্র পাঠ করিতে করিতে যখন তাঁহার চিত্ত ব্রহ্ম আবির্ভাবে পরিপূর্ণ হইত, তখন তিনি তাহাতে আত্ম-সমাধান করিয়া স্বর্গসুখ অনুভব করিতেন।

আমরা যখন মহর্ষির জীবনবেদ পাঠ করি, তখন সে গ্রন্থে দুইটী বিশেষ কথা পাঠ করিয়া পুলকিত হই। প্রথম কথা, বিশ্বজগতে বিশ্বনাথের আবির্ভাব উপলব্ধি করা, দ্বিতীয় কথা প্রাণের অন্তস্তলে তাঁহাকে দর্শন করিয়া কৃতার্থ হওয়া।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ প্রকৃতি-বেদ পাঠ করিতে পরব্রহ্মের সহিত নিত্য একত্বে উপনীত হইলেন, ব্রহ্ম-রস পানে বিভোর হইলেন। অপর দিকে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ভক্ত-জীবন-বেদ পাঠ করিতে করিতে সমন্বয়-রাজ্যে উপনীত হইয়া পরব্রহ্ম-সদনে স্বীয় জীবন-বেদ পাঠে রত হইলেন। এস্থলে ব্রাহ্মসমাজের তিন জন প্রচারকের ত্রিবিধ ভাবের কথা স্মরণ হয়। রাজর্ষি রামমোহন বিশ্বজনীনমন্ত্র ঘোষণা করিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ নিরাকার পূর্ণ ব্রহ্মের উপাসনা, যোগ ভক্তি স্বীয় জীবনদ্বারা প্রচার করিলেন, এবং ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সাধু ভক্ত-গণের এবং স্বীয় জীবনবেদ পাঠ করিয়া সর্ব্ব ঘটে বিধাতার বিধান দর্শন করিলেন। জীবন-বেদ পাঠ কেশবচন্দ্রের বিশেষভাব।

ব্রাহ্ম সাধক প্রকৃতি-বেদে তাঁহারই হস্তের লেখা পাঠ করিবেন। ঊর্দ্ধে অনন্ত আকাশে চন্দ্র সূর্য্য, গ্রহ নক্ষত্র খচিত, তদুপরে আরো কত কোটি কোটি গ্রহ-তারামণ্ডিত অন্তরীক্ষ আরো কত কোটি কোটি সৌরজগৎ সীমাহীন অনন্ত দেশে অনন্ত পথে বিদ্যমান। ইহার মধ্যে অনন্ত ব্রহ্মের হাতের লেখা দেদীপ্যমান।

নিম্নে রত্নাকরের সুবিশাল, সুগভীর নীলাম্বুরাশি, স্থলভাগে উন্নত পর্ব্বতমালা, বনস্পতি, নদনদী প্রস্রবন, কুসুমিত কুঞ্জ-কানন, শ্যামল, শস্য ক্ষেত্র, ইহার মধ্যে শিবসুন্দর পরব্রহ্মের সুন্দর অক্ষরের লেখা। সৃজনশক্তি পালনী-শক্তি এবং বিচিত্রতার মধ্যে তাঁহার হাতের লেখা ফুটিয়া উঠিয়াছে। জনৈক ভক্ত কবি গাহিয়াছেন,—"হে প্রভো, আমি যে দিকে দৃষ্টিপাত করি, সে দিকেই তোমার হাতের লেখাতে তোমার চিন্তারাজি পাঠ করিয়া মোহিত-বিস্মিত হই।"

মহাপুরুষগণের জীবনবেদে প্রভু পরমেশ্বরের হস্ত-লিখিত গীতি পাঠ করিয়া বেদপাঠক ভক্তগণ মুগ্ধ হন। বুদ্ধের জীবনবেদে, বেদ-রচয়িতা ভগবান কি লিখিয়াছেন? সে বেদের তিনটী মন্ত্র অতি স্পষ্ট অতি উজ্জ্বল এবং শিক্ষা-প্রদ। মন্ত্রত্রয় বুদ্ধের জীবন বেদের আদি অন্ত মধ্যে উন্নত গিরিশৃঙ্গের ন্যায় দণ্ডায়মান। সেই মন্ত্র এই, পুরুষকার, দুঃখজয়, এবং নির্ব্বাণ। এই তিনটী মন্ত্র বিধাতা কি স্বহস্তে বুদ্ধের জীবনবেদে লিখিয়া দেন নাই? বুদ্ধত্ব কোথায়? পুরুষকারে, দুঃখ-বিজয়ে এবং নির্ব্বাণে।

যীশুর জীবনবেদে বিধাতা পুরুষ কি লিখিলেন? লিখিলেন—পিতা, পুত্র এবং পবিত্রাত্মার সম্মিলন। পিতার মধ্যে পুত্রের অনন্ত-ব্যক্তিত্ব, অনন্ত প্রতিষ্ঠা এবং অনন্ত সম্ভোগ। পিতার ন্যায় পূর্ণতা লাভ, জগতে পিতৃত্ব ও ভ্রাতৃত্ব এবং স্বর্গরাজ্য স্থাপন। যীশুর জীবনবেদ কেমন সুখপাঠ্য, কেমন মনোহর, এবং মধুর ভাবময়।

মহম্মদের জীবনবেদে বিধাতা লিখিয়া দিলেন, এক ঈশ্বর, এক শাস্ত্র, এক ধর্ম্মমণ্ডলী এবং জাতি। একের কেমন প্রতিষ্ঠা!

কেবল এই তিনজন অথবা এরূপ অসাধারণ ক্ষমতাশালী ভক্তগণের জীবনবেদেই বিধাতার হস্তাক্ষর প্রকাশিত? তাহা নহে—ব্রহ্মর্ষি, মহর্ষি, রাজর্ষি, সেণ্ট, সুফি, ফকির, সন্ন্যাসী, সকল সাধু ভক্তের জীবনবেদেই বিধাতার লেখা পাঠ করিয়া ব্রাহ্ম সাধক কৃতার্থ হন।

বলা বাহুল্য, ভক্ত-জীবনবেদের সকল অংশ প্রভু পরমেশ্বরের লেখন-প্রসূত নহে। যে অংশ প্রভুর রচিত, তাহা শুদ্ধ, সত্য প্রেম ও আনন্দময়, অনন্ত স্থায়ী সম্পত্তি, তাহা বিশ্বজনীন, সকলের অনুসরণীয় এবং গ্রহণীয়। তাহা শরীর মনের স্বাস্থ্যবর্দ্ধক, জ্ঞান ও ভক্তির জনক।

সাধারণ হিন্দুগণ বিশ্বাস করেন, বিধাতা-পুরুষ, জন্মগ্রহণের ষষ্ঠ দিবসে শিশুর নিকটে উপনীত হইয়া শুভাশুভ ফল তাহার কপালে লিখিয়া দেন। বাস্তবিক বিধাতাপুরুষ কপালে লেখেন না, প্রত্যেকের হৃদয়ে—হৃদয়পটে লিখিয়া থাকেন। একদিন লিখিয়া তিনি চলিয়া যান না, প্রতিদিন লেখেন এবং তাহা সন্তানকে পাঠ করাইয়া থাকেন। যিনি তাঁহার কাছে জীবনবেদ পাঠ করিতে থাকেন

লোকে তাঁহাকেই "অন্যপ্রাণিত-আত্মা, "জ্ঞানী," "ভক্ত" বলিয়া পূজা করে। এই জীবনবেদ পাঠ বিষয়ে স্থূলরূপে কয়েকটি কথা অগ্রে নিবেদন করিতেছি।

এই সৃষ্টি-কৌশলে স্রষ্টার পরিচয়লাভ গুরুতর বিষয় নহে। বিশ্বরাজ্যে বিধাতাকে সৃষ্টিকর্ত্তা, পালনকর্ত্তারূপে দর্শন করিয়া মন তাঁহার উদ্দেশ্যে প্রণত হইয়া থাকে। মন নিঃসন্দেহরূপে বলিয়া উঠে, এ সৃষ্টি স্বয়ম্ভু নহে, ইহা আকস্মিক ব্যাপার নহে; এক জ্ঞানময় অনন্ত শক্তিশালী মহাপুরুষ ইহার রচয়িতা। তিনি চিরকর্ম্মশীল, অনন্ত কাল ধরিয়া একটা গড়িতেছেন, আর একটা ভাঙ্গিতেছেন। সৃষ্টবস্তু সমূহ সৃষ্টিকর্ত্তায় বিশ্বাস আনিয়া উপস্থিত করে। তিনি শক্তিরূপী, তিনি সৃষ্টিকর্ত্তা, এ বিশ্বাস মানব জাতির শৈশব অবস্থায় লভ্য। তৎপর ভক্তজীবনে তাহার প্রকাশ দেখিয়া মানবমন আরো বিশ্বাসলাভ করে। ভক্তজীবনে ধর্ম্মের জ্যোতিঃ প্রকাশিত, ভক্তির উৎস উৎসারিত, বৈরাগ্য, বিনয়, অনাসক্তি, জীবে দয়া প্রভৃতি গুণসমূহ দর্শনে মন সহজেই এই বিশ্বাসে উপনীত হয় যে, তিনি কেবল সৃষ্টি স্থিতি পালন করেন না, তিনি মানব অন্তরে প্রকাশিত হইয়া মানবকে দেবত্ব দান করেন। প্রাকৃতিক জ্ঞান বিজ্ঞান হইতে বঞ্চিত সূত্রধরতনয় যীশুর প্রাণে তিনি কি উজ্জ্বল আলোক প্রকাশ করিলেন। সেই সূত্রধরনন্দন নরনারীর হৃদয়ে রাজপদে বরিত হইলেন। যীশুর মধ্যে পরব্রহ্মের কেমন প্রকাশ! মহম্মদ লেখাপড়া জানিতেন না; কিন্তু ব্রহ্ম তাঁহাতে প্রকাশিত হইয়া তাঁহাকে ধর্ম্মোপদেষ্টা মহাপুরুষের আসনে প্রতিষ্ঠিত করিলেন। কি অলৌকিক ব্যাপার! ভক্তদিগকে দর্শন করিয়া, ভক্তগণের কার্য্যাবলী পাঠ করিয়া, তাঁহাদের জীবন আলোচনা করিয়া মানব-মন স্বতঃই বলিয়া উঠে, "হে প্রভো, তুমি মানবপ্রাণে প্রকাশিত হইয়া থাক। সত্য সত্যই তুমি বোবাকে কথা বলাইতে, বধিরকে শ্রবণ করাইতে, অন্ধকে দর্শন করাইতে পার। তোমার স্পর্শে সত্য সত্যই লৌহ স্বর্ণ হইয়া যায়। ঘোরতর মহাপাপী দেব-জীবন লাভ করিয়া নরনারীর পূজা প্রাপ্ত হয়। সত্য সত্যই তুমি মানবকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিয়া তদ্দ্বারা অদ্ভুত কার্য্য সম্পাদন কর। সাধু ভক্তগণের জীবন দর্শন করিয়া কে তোমাকে অস্বীকার করিতে পারে?" বাস্তবিক ভক্তদিগকে দর্শন করিয়া তাঁহাদের সঙ্গ লাভ করিয়া ভক্তাধিপতির প্রতি অনুরাগ আরম্ভ হয়।

সর্ব্বাপেক্ষা কঠিন এবং গুরুতর সাধনা স্বীয় জীবনে তাঁহাকে প্রত্যক্ষ করা। এখানে কোথায় পরমেশ্বর! হৃদয়, মন, প্রাণ, সকলই আমিত্বময়। চিন্তায় আমিত্ব, ভাবে আমিত্ব এবং কার্য্যে আমিত্ব। এই আমিত্ব-রোগের ব্যাধি-কর্ত্তৃক আক্রান্ত হইয়া ঈশ্বর-স্পর্শ শক্তি বিদূরিত হইয়াছে। ঘোর আমিত্বময় রাজ্যে ঈশ্বরের নাম গন্ধ থাকিতে পারে না। মুখে "ঈশ্বর

ঈশ্বর" কিন্তু ভিতরে আমিই সকল। প্রকৃতি এবং সাধু-জীবনে ঈশ্বরের অনুসন্ধান পাইয়া মন যখন স্বীয় জীবন রাজ্যে প্রবেশ করিল, তখন আমিত্বের গোলক-ধাঁধায় পড়িয়া দিশা-হারা হইয়া গেল। তখন প্রাণ ক্লান্ত ও পরি-শ্রান্ত হইয়া বলিয়া উঠিল,—"হে অনন্ত ভুবনের ঈশ্বর, হে ভক্তজীবনের প্রভু! তুমি আমার জীবনে কোথায়? এখানে যে সকল দিকে কেবল আমিই বসিয়া রহিয়াছি। আহারে, ভ্রমণে, বিশ্রামে আমি। প্রাণের অন্তস্থল হ'তে যখন এই প্রার্থনা ধ্বনি উত্থিত হইল, তখন অবিশ্বাস-দুর্গ বিচূর্ণ করিয়া, আমিত্বের জাল ছিন্ন করিয়া, সংশয়-তিমির বিদূরিত করিয়া কাহার বেদ গান উত্থিত হইল। কে অমৃত-ময় আনন্দময় সঞ্জীবন-মন্ত্রে গাহিয়া উঠি-লেন:—

"আমি আছি, আমি আছিরে জীব!
দেখ দেখ আমায় চাহিয়ে;
সম্পদে বিপদে সুখে কিংবা দুঃখে,
রয়েছি তোমারে ঘেরিয়ে।"

মন প্রাণ জীবনবেদ-পাঠ সুধাসাগরে নিমগ্ন হইল। "আমি আছি" জীবনবেদের প্রধান মন্ত্র। তিনি আছেন, আমি তাহাকে জ্ঞান বিজ্ঞান দ্বারা জানিতে পারি না, বহু শাস্ত্র অধ্যয়নদ্বারা জানিতে পারি না, তর্ক যুক্তিদ্বারা জানিতে পারি না, কেবল আমি আছি বলিয়া তিনি যখন সাক্ষ্য প্রদান করেন তখনই আমি-ত্বের প্রাচীর ভেদ করিয়া তাঁহার জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি দৃষ্টিগোচর হয়। তখন দেখি এত দিন যে আমিত্ব ব্রহ্ম-উপলব্ধির অন্তরায় স্বরূপ ছিল, সেই আমিত্বের বিলোপ হইয়া ব্রহ্মের সিংহাসন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। তখন প্রাণ জীবন বেদের এই অংশ পাঠ করিয়া উঠিল:—

"তুমি প্রাণ, আমার প্রাণের প্রাণ
আমার সকলি ত তুমি হে,
আমার অস্তিত্ব চৈতন্য সকলি ত তুমি
তুমি ত আমার স্বামী হে।"

তুমি আমার বাহুতে শক্তিরূপে মস্তিষ্কে জ্ঞানরূপে হৃদয়ে প্রেমরূপে, প্রাণের মধ্যে প্রাণ-এবং আত্মার মধ্যে আত্মারূপে বিদ্যমান। আমি আমার আমিত্বের বড়াই আর কি করিতে পারি? তুমি যে সর্ব্ব স্থান পূর্ণ করিয়া অদ্বি-তীয় ব্রহ্ম বিরাজিত হইলে। আমিত্বের বেড়া দিয়া আর কোন স্থানকে স্বতন্ত্র করিতে পারি? আমিত্বের ঘন অন্ধকার বিদূরীত করিয়া হে তুমি। তুমি প্রকাশিত হইলে।

প্রাণ হৃদয়েশ্বরের সাক্ষাৎলাভ করিয়া মহা-নন্দে জীবন বেদ সঙ্গীত গাইয়া উঠিল;—

"তোমায় কেমনে ছাড়িব হে,
ছেড়ে কোথায় বা যাই হে,
ছেড়ে কোথায় দাঁড়াই হে,
(আমার উর্দ্ধ অধঃতে তুমি)
(আমার অন্তরে বাহিরে তুমি)
(আমার জীবনে মরণে তুমি)
তুমি আদি অনাদি, অনন্ত তুমি,
কারণ-কারণ হে।

তুমি সত্য সনাতন, চিৎঘন রঞ্জন,

অগম্য অপার হে।

তুমি বিঘ্নবিনাশন, পাতকী-তারণ,

দুর্গতিতারণ হে।

তুমি নিত্যনিরঞ্জন, চিত্তবিনোদন,

পাবন শোভন হে।

তুমি সত্যম্ শিবম্, সুন্দর মধুরম্,

প্রাণ মনোমোহন হে।"

জীবনবেদের প্রথম অধ্যায়-জ্ঞানকাণ্ড। এ অধ্যায়ে ঈশ্বর আত্মপরিচয় প্রদান করিলেন। জীবের সাধ্য নাই তাঁহাকে চিনিতে পারে; তিনি যখন আত্মপ্রকাশ করেন, তখনই জীব "এই ত হৃদয়েরে, এই ত হৃদয়ে, আমার প্রাণ সখা সদা বিরাজিত রে এই ত হৃদয়ে" বেদ-গাথা গাহিয়া উঠে।

জীবনবেদের দ্বিতীয় অধ্যায়-প্রেম কাহিনীতে পরিপূর্ণ। দয়াময় পরব্রহ্ম তাঁহার সৃষ্ট মানবসন্তানকে কত ভাল বাসেন, তাহা তিনি আপনার সুরে গাহিয়া শুনাইয়া থাকেন তিনি হৃদয়ে আসিয়া অমৃতময় স্বরে বলেন, "হে জীব, আমার প্রিয় সন্তান, সকলে তোমাকে পরিত্যাগ করিলেও আমি তোমাকে পরিত্যাগ করিব না—শত অপরাধে অপরাধী হইলেও আমি তোমাকে কখনও বিনষ্ট করিব না। বিপদের ঘন অন্ধকারে আমি তোমাকে আশার আলোক দর্শন করাইব। ভীষণ শোকের মধ্যে তোমাকে সান্ত্বনা প্রদান করিব। আমি তোমাকে মুক্ত করিয়া বিশ্বাসের সিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিব। আমি তোমার বিত্ত হইতে প্রিয়, পুত্র হইতে প্রিয়, সকল প্রিয় হইতে প্রিয়তম। আমি তোমাকে প্রেমে সৃষ্ট করিয়াছি, ভালবাসিয়াই অনন্ত জীবন দান করিয়াছি এবং আমার সহিত প্রীতিসূত্রে যুক্ত করিয়াছি। তুমি ছাড়িলেও আমি তোমায় ছাড়ি না, তুমি দূরে চলিয়া গেলেও আমি পশ্চাৎ পশ্চাৎ যাই, তুমি ভুলিয়া গেলে আমি কখনও ভুলি না।

এই অধ্যায়ে ব্রহ্মকৃপার অপূর্ব্ব গাথা গাহিয়া সাধক বিমুগ্ধ হইয়া থাকেন। এ অধ্যায়ের প্রতি ছত্রে ছত্রে ব্রহ্মকৃপার অপূর্ব্ব রস প্রবাহিত। প্রভু পরমেশ্বর স্বয়ং যখন প্রেমের পরিচয় প্রদান করেন, তখন কি প্রাণ নীরস পাষাণের ন্যায় থাকিতে পারে? তিনি আসিয়া যখন তাঁহার প্রেম সুধা পান করান, তখন মনে বিস্ময়ান্বিত হইয়া বলিয়া উঠে।—"কে জানেরে দয়াল নামে এত সুধা ছিল, সুধা পানে উন্মত্ত প্রাণ আকুল হইল।

ভগবান যে জীবকে ভাল বাসেন, তিনি যে পূর্ণ অহেতুকী প্রেমে জীবকে আলিঙ্গন করেন এ তত্ত্ব ভগবান আপনি আসিয়া প্রকাশ করেন। তাঁহার যে কত করুণা, জীবের প্রতি কত করুণা। তাহা তিনি দেখাইয়া থাকেন। জীবনবেদের এই প্রেমের অধ্যায় পাঠ করিয়া সাধক অশ্রু সংবরণ করিতে পারেন না। অধমকে তিনি এত ভালবাসেন! যে তাঁহাকে চায় না, তার জন্য তিনি এত ব্যস্ত। পাপী উদ্ধারের জন্য তাঁর এত আয়োজন!

জীবনবেদের তৃতীয় অধ্যায়—কর্ম্মকাণ্ড। এ অধ্যায়ে ভগবান বলিতেছেন, "আমি চির-কর্ম্মশীল, হে সন্তান! তুমি কর্ম্ম কর। আমার সন্তানগণ তোমার ভ্রাতৃ ভগিনী, তাহাদের জন্য কর্ম্ম কর। কর্ম্মেরই জন্য তোমাকে সৃষ্টি করিয়াছি। আমার অনুগত হইয়া আমার প্রীতি-কামনায়, আমার আবেশে কর্ম্ম করিতে থাক। ক্ষতি লাভ গণনা না করিয়া, ফলাফল বিচার না করিয়া, কেবল আমার আজ্ঞাবহ ভৃত্য হইয়া কর্ম্ম কর।"

সাধক প্রাণের মধ্যে ব্রহ্ম-লিখিত এই বেদ-পাঠ করিয়া বলিলেন;—"তুমি যা বলিবে তাই করিব, আমি কিছুনা জানি।"

এই তিনটী অধ্যায়ে জীবনবেদ সম্পূর্ণ. জ্ঞান কাণ্ড, ভক্তি কাণ্ড এবং কর্ম্মকাণ্ড। এই তিনকে বিশ্লেষণ করিলে দুইটী তত্ত্ব পাওয়া যায়—প্রীতি ও প্রিয়কার্য্য।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কি? এ প্রশ্নের স্থূল প্রত্যুত্তর এই যে,স্বীয় জীবনে পরমেশ্বরকে প্রতিষ্ঠিত দেখিবার নামই ব্রাহ্মধর্ম্ম। ইহা কঠিন হইলেও ইহাই আমাদের সাধনের বিষয়। আমার জীবনে তিনি কিরূপ লীলা করিতেছেন, আমি কোন্ পথে গিয়া অন্ধকারময় গর্ত্তে পতিত হইয়া-ছিলাম, তিনি কিরূপে আমাকে অপর দিকে লইয়া আসিলেন, কিরূপে ধীরে ধীরে পাপের বন্ধন খুলিয়া দিতেছেন, আমার ধর্ম্মজীবন লাভের জন্য যে স্থানে গমন, যে গ্রন্থপাঠ, যাঁহার সঙ্গপ্রয়োজন, তাহা অপূর্ব্ব ভাবে ঘটাইতেছেন এরূপ স্থূল সূক্ষ্ম বিবিধ কাহিনী সমূহ জীবনবেদে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত। ব্রহ্মসমাজে এমন অনেক ব্যক্তি আছেন, যাঁহারা স্বীয় স্বীয় জীবনবেদ পাঠ করিয়া ভক্তির অশ্রু বিসর্জ্জন করিতেছেন। যে ব্যক্তি সুরাপান করিতে করিতে, অসত্য পথে চলিতে চলিতে, নানা প্রকার ভীষণ পাপে আক্রান্ত হইয়া নরকে বাস করিতেছিল, প্রভু আসিয়া তাহার হাতে ধরিলেন এবং বলিলেন আর পাপ করিতে পারিবে না, আমি তোমাকে উন্নত করিব, সম্মানিত করিব, তোমাকে আমার ভক্তগণের মধ্যে স্থান দান করিব।" তাহাই হইল। মহাপাপী ব্রাহ্ম সমাজের ভক্ত পরি-বারে গৃহীত হইল। সে ব্যক্তি জীবনবেদে দয়ার মন্ত্রগুলি, পিতার প্রেমলীলা পাঠ করিয়া কি নৃত্য করিবে না?

আসুন ভাই ভগিনি! আমারা স্বীয় স্বীয় জীবন-বেদ পাঠে রত হই। আমার নিষ্ঠাবান বেদধ্যায়ী হই, পূর্ণ ব্রহ্ম আমাদের প্রত্যেকের হৃদয়ে চতুষ্পাঠি খুলিয়াছেন। অধ্যাপক তিনি। আমারা তাঁহার ছাত্র। তাঁহার নিকট তাঁহার লিখিত বেদপাঠ করি। বিশ্বাসীর নিকটে এ গ্রন্থের ন্যায় আর গ্রন্থ নাই। আমাদের বিশ্বাস বর্দ্ধিত হউক, আমাদের মধ্যে এ গ্রন্থের আদর হউক। এই জীবনবেদই আমাদের অনন্ত কালের একমাত্র ধর্ম্ম-গ্রন্থ।

শ্রীকাশীচন্দ্র ঘোষাল।

———

মোহ।

স্বর্ণ উষার অরুণ কান্তি,
সুন্দর মনোমোহন রূপ !
নিখিল মানব, মানস সৌধে,
তোমারি আসন, হে ভব-ভূপ !
পাখী গাহে তব, চিরজয় গাঁথা,
কুসুম-সুরভি কানন বাসে ;
তোমারি আরতি, করে গ্রহ তারা,
বিটপী কুঞ্জে জ্যোছনা হাসে !
তরুণী-ভামিনী, হরিণাপাঙ্গে,
স্বরগ শুভ্র শিশুর মুখে,
তোমারি পূজার, সোহাগ-অর্ঘ্য,
দিবস যামিনী রচিছে সুখে।
বিভোর মত্ত, বদ্ধ এ হৃদি,
তোমারি বাহুর কণকডোরে,
সুখের শয়নে, প্রেমের অমরা,
তোমারি রচনা স্বপনঘোরে।
যা কিছু কর্ম্ম, ধর্ম্মাধর্ম্ম,
লুণ্ঠিত তব চরণতলে।
জীবনে মরণে, সুসাজে সুবেশে
ভুলাও হৃদয় কত না ছলে॥

শ্রীবসন্ত কুমার চক্রবর্ত্তী।

কুমার ভীমসিংহ।

(ঐতিহাসিক উপন্যাস)

রাত্রি এক প্রহর অতীত, কুমুদিনীকান্ত শুভ্র কিরণ মালা ধরাপৃষ্ঠে ঢালিয়া দিতেছেন; চকোর চকোরী সুধাপান আশে চন্দ্রের পানে চাহিয়া আছে। নক্ষত্রগণ নিশানায়ককে পরিবেষ্টন পূর্ব্বক নীলাকাশের শোভা বর্দ্ধন করিতেছে। বসন্তের মৃদুমন্দ বায়ু রহিয়া রহিয়া বহিয়া জগতকে শীতল করিতেছে। বসন্তকালের শিশির সিক্ত প্রফুটিত পুষ্প-কুলের সৌরভ অনিলের সহিত মিলিত হইয়া সকলকে সুগন্ধ দান করিতেছে। ধরা নব সাজে সজ্জিত। তাহা দেখিয়া একটী পাপিয়া বৃক্ষে বসিয়া সুমধুর স্বরে তান ছাড়িতেছিল। এমন সময়ে একটী প্রকাণ্ড অট্টালিকার একটী ক্ষুদ্র কক্ষে মিবারের যুবরাজ ভীমসিংহ উপবেশন করিয়া আছেন, পার্শ্বে যুবরাজ-মহিষী মায়াবতী ও বসিয়া আছেন। কাহারও মুখে বাক্য নাই, উভয়েই নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করিতেছেন। গৃহের মধ্যে একটী দীপ মৃদুভাবে জ্বলিতে ছিল; তাহার স্নিগ্ধ কিরণে সমস্ত কক্ষটী স্নিগ্ধভাব ধারণ করিয়াছে। হঠাৎ গৃহের নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করিয়া মায়াবতী কহিলেন, যুবরাজ যদি তোমার পিতা তোমায় রাজ্য না দিয়া জয়সিংহকে দেন তবে তুমি কি করিবে?

যুব। তুমি কি করিতে বল?

মায়া। যুদ্ধ করিবে।

যুব। বুঝিলাম যেন যুদ্ধ করিব। কেননা যুদ্ধই রাজপুতের ধর্ম্ম কিন্তু যদি আর যুদ্ধক্ষেত্র হতে না ফিরি তবে?

মায়া। তবে রাজপুত ললনা যাহা করিয়া থাকে তাহাই করিবে; জলন্ত চিতায় এ দেহ ভস্মীভূত করিবে

যুব। হারিলাম। তোমার সঙ্গে কথায় পারিব না।

মায়া। থাক সত্যই যদি তোমার পিতা তোমায় সিংহাসন প্রদান না করেন, তবে তুমি কি করিবে?

যুব। কেন, যুদ্ধ করিব। যতদিন এ দেহে জীবন থাকিবে, বাহুতে বল থাকিবে, ততদিন আমার ন্যায্য সিংহাসন জয়সিংহকে কখনই অধিকার করিতে দিব না। বলিতে বলিতে ভীমসিংহের নয়নদ্বয় জ্বলিতে লাগিল, সর্ব্বশরীর কাঁপিতে লাগিল, হস্ত দৃঢ়মুষ্টিবদ্ধ হইল। তিনি পুনর্ব্বার বলিলেন---মায়াবতী তুমি জান পিতা চিরকাল জয়সিংহের পক্ষপাতী অথচ জয়সিংহের কিগুণ আছে? সে রণ কৌশল জানে না, স্বদেশ শাসন করিতে জানে—সে কি জানে? অথচ মহারাজ তাহার পক্ষপাতী। আমাদের রাজ্য দেখিতেছি মুসলমানের রাজ্যে পরিণত হইতে চলিল। মায়াবতী—এইরূপ বলিতে বলিতে কত কথাই মনে পড়িতেছে। একদিন আমিও জয়সিংহ আমাবলী

পর্ব্বতের উপর ভ্রমণ করিতেছি এমন সময় একটী প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র আমাদের সম্মুখে আসিয়া উপস্থিত হইল। জয়সিংহ ভয় পাইল. সে ক্ষিপ্রগতিতে একটী বৃক্ষে আরোহণ করিল। আমি তাহার ভীরুতা দর্শনে হাস্য সংবরণ করিতে পারিলাম না। দেখিতে দেখিতে ব্যাঘ্রটী আমাকে লক্ষ করিয়া লম্ফ প্রদান করিল। আমি তখন সবলে ব্যাঘ্রকে আক্রমন করিলাম। মুহূর্ত্তমধ্যে ব্যাঘ্রটীকে পরাজিত করিয়া তাহার দেহ হইতে মস্তক বিচ্ছিন্ন করিলাম। তখন জয়সিংহ বৃক্ষ হইতে অবতরণ করিয়া আমার শক্তি ও সাহসের ভূয়সী প্রশংসা করিতে লাগিল। এসংবাদ মুহূর্তমধ্যে মহারাজের কর্ণগোচর হইল। তিনি ভুলক্রমে শুনিলেন, জয়সিংহ মল্লযুদ্ধে একটি ব্যাঘ্রকে নিহত করিয়াছে। অমনি জয়সিংহকে দেখিবার জন্য আরাবল্লী পর্ব্বতাভিমুখে আগমন করিতে লাগিলেন। আমরাও উভয়ে তখন আরাবল্লী পর্ব্বত হইতে প্রত্যাবর্ত্তন করিতেছি এমন সময় পথি মধ্যে মহারাজের সহিত আমাদের সাক্ষাৎ হইল। মহারাজ কহিলেন, জয়সিংহ! শুনিলাম তুমি নাকি মল্লযুদ্ধে একটি ব্যাঘ্রকে নিহত করিয়াছ? জয়সিংহ অভিবাদন পূর্ব্বক বিনীতভাবে উত্তর করিলেন:—না মহারাজ, আমি ব্যাঘ্রকে বধ করি নাই, ভীমসিংহ করিয়াছেন। তখন মহারাজ জয়সিংহের মুখচুম্বন করিয়া কহিলেন:—কালে তুমিও মল্লযুদ্ধে ব্যাঘ্রকে বধ করিতে পারিবে। এই বলিয়া তিনি জয়সিংহকে কতই আদর করিলেন কিন্তু আমার প্রতি একটীবার চাহিলেনও না; সে আজ অনেক দিনের কথা সেইদিন হইতেই বুঝিয়াছি, মহারাজ জয়সিংহের পক্ষপাতী, তাহাকেই মহারাজ সিংহাসন প্রদান করিবেন। কিন্তু যেদিন দেখিব সত্যসত্যই জয়সিংহকে সিংহাসন দিয়াছেন, সেইদিন হইতে এমন সমরানল প্রজ্বলিত করিব যাহাতে দেশে রক্তগঙ্গা প্রবাহিত হইবে। বলিতে বলিতে ভীমসিংহের স্বর কাঁপিতে লাগিল তাঁহার কণ্ঠ রোধ হইল. তিনি আর কথা কহিতে পারিলেন না। ভীমসিংহের অতিরিক্ত উত্তেজনা দেখিয়া মায়াবতী সিংহাসনের কথা পরিত্যাগ করিয়া অপর কথার অবতারণা করিলেন।

এদিকে বৃদ্ধা রাজমহিষী মহারাজ রাজসিংহের নিকটবর্ত্তী হইয়া বলিলেন—মহারাজ, যাহা শুনিতেছি ও লোক-পরম্পরায় যাহা বলাবলি করিতেছে তাহা সত্য কি? বলিয়া রাজমহিষী কমলকুমারী উত্তরের প্রতীক্ষায় এক দৃষ্টে রাজসিংহের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। মহারাজ রাজসিংহ কথাটী যে হৃদয়ঙ্গম করিতে অসমর্থ হইলেন—তাহা নহে তথাচ কথাটি কি স্পষ্টভাবে জানিবার জন্য বলিলেন,—লোক-পরম্পরায় কি বলাবলি করিতেছে?

কমল। আপনার সিংহাসন নাকি জয়সিংহ অধিকার করিবে? এ যে দেখিতেছি হিন্দুরাজ্য মুসলমান রাজ্যে পরিণত হইতে চলিল। কমলকুমারীর কথা মহারাজের কানে বড় ভাল লাগিল না. তিনি বলিলেন, জয়সিংহ

আমার সিংহাসন মুসলমানদের ন্যায় কাড়িয়া লইতেছে না; আমার সিংহাসন আমি তাহাকে দান করিতেছি। ইহাতে হিন্দুরাজ্য মুসলমান রাজ্যে কি প্রকারে পরিণত হইতে চলিল? কমলকুমারী মহারাজের প্রতি তীক্ষ্ণ কটাক্ষপাত করিয়া কহিলেন:—তুমি তবে বলিতে চাও যে, তুমি রাজ্যশাসন করিতে অক্ষম, তাই জয়সিংহকে সিংহাসন প্রদান করিতে চাহিতেছ, কিন্তু ইহার পরিণাম কি হইবে জান?

মহারাজ। পরিণাম ভাল হইবে বলিয়াই আমি এ কাজ করিতেছি, যাহাতে আমার মৃত্যুর পরে ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ না বাধে তাই আমার উদ্দেশ্য,তাই আমি আমার রাজ্যের বন্দোবস্ত করিতে,প্রজার মঙ্গল সাধন করিতে আমার সিংহাসন জয়সিংহকে প্রদান করিব।

কমল। কিন্তু আমি দেখিতেছি, তুমি ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ মিটাইতে গিয়া, ভ্রাতায় ভ্রাতায় বিবাদ বাধাইবার পথ প্রশস্ত করিতেছ। রাজ্যের বন্দোবস্ত করিতে গিয়া রাজ্য ছারে খারে দিবার যোগাড় করিতেছ। আর যদি যথার্থই তুমি থাকিতে থাকিতে রাজ্যের বন্দোবস্ত করিতে চাও, তবে ভীমসিংহকে সিংহাসন দান কর না? পৈত্রিক সিংহাসনে জ্যেষ্ঠেরই ন্যায্য অধিকার, তবে কেন ছোটকে সিংহাসন দিতে চাও?

কথাগুলি অতি সত্য। কিন্তু সত্য কথা—ন্যায্য কথা,অতি প্রিয়জনকে বলিলে—তাহারও কখনও কখনও তিক্ত বোধ হয়। সেজন্য কমলকুমারীর কথাগুলা মহারাজের ভাল লাগিল না, তিনি বলিলেন, রাজ্যশাসন সম্বন্ধে স্ত্রীলোকে কিছু বোঝে না, আর ভীমসিংহ অপেক্ষা কুমার জয়সিংহের রাজ্যসম্বন্ধে অধিক অভিজ্ঞতা আছে। সেজন্যই তাহাকে সিংহাসন প্রদান করিতেছি, নচেৎ বয়সের ইতর বিশেষে বড় আসে যায় না।

কমল। না, রাজ্যশাসন সম্বন্ধে স্ত্রীলোকেরা কিছুই জানে না! কেবল মহারাজ জানেন। একবার ইতিহাসের পাতা উল্টাইয়া দেখিবেন, কত কত স্ত্রীলোক রাজ্যশাসন করিয়াছেন এবং বয়সের ইতর বিশেষ কি বলিতেছেন আমরা জানি যে বড় সেই সিংহাসন পাইবে। আরও জিজ্ঞাসা করি,জয়সিংহ কিসে ভীমসিংহ অপেক্ষা উপযুক্ত? শৌর্য্যে, বীর্য্যে, বুদ্ধিমত্তায়, সততায় কিসে ভীমসিংহ জয়সিংহ অপেক্ষাহীন? সৈন্যগণ কাহার সাহসে বশীভূত ও রণ-কৌশলে পরিচালিত? সভাসদেরা কাহাকে অধিক সম্মান প্রদর্শন করে? প্রজারা কাহাকে তাহাদের ভাবী রাজা বলিয়া স্বীকার করে? তাহারা কাহাকে রাজসিংহাসনে প্রতিষ্ঠিত করিতে চায়? একবার রাজ্যমধ্যে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক সকলকে জিজ্ঞাসা করিয়া আইস, কে রাজার উপযুক্ত জানিতে পাইবে। তবে যদি তোমার রূপবতী মহিষীর প্রিয়পুত্র বলিয়া জয়সিংহ রাজার উপযুক্ত হয়—তবে সে স্বতন্ত্র কথা।" এ বিদ্রূপবাণ মহারাজের মর্ম্মে মর্ম্মে বিদ্ধ করিল,তিনি আর ক্রোধ সংবরণ করিতে পারিলেন না, তিনি ক্রোধভরে বলিলেন, "তবে

তাই" "তবে তাই"; কথাটী রাণীর ক্রোধে ঘৃতাহুতি প্রদান করিল তিনি অমনি লাফাইয়া উঠিলেন, বলিলেন, তবে সে কথাটা স্পষ্টভাবে বলিলেই হয়, অত ঘুরাইয়া ফেরাইয়া বলার প্রয়োজন কি? রাজা হইয়া স্পষ্ট কথা বলিবার সাহস ত নাই? রাজা রাগিয়া বলিলেন, যদি স্পষ্ট কথা না বলিতে পারিতাম, মনের কথা মনে লুকাইতাম, তবে জয়সিংহকে রাজত্ব দিতেও কুণ্ঠিত হইতাম। আমার রাজ্য আমি যাহাকে ইচ্ছা দিব—তাহাতে কাহারও কোন কথা বলিবার অধিকার নাই। কমলকুমারী আর সহ্য করিতে পারিলেন না, শয্যা হইতে তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইলেন, ক্রোধপূর্ণ স্বরে কহিলেন, না মহারাজ, আপনার রাজ্য বলিয়া যাহাকে ইচ্ছা তাহাকে দিতে আপনার কোন শক্তি নাই। আপনি রাজা বলিয়া অবৈধ বিচার করিতে পারেন না, যে রাজা পক্ষপাতমূলক বিচার করেন তিনি রাজা নহেন, তিনি স্বেচ্ছাচারী, তিনি অধর্ম্মাচারী। আপনার রাজ্য আপনি যাহাকেই দিন, আর যে কেহই গ্রহণ করুক, আমার পুত্র তাহা এখন গ্রহণ করিবে না। যখন সে নিজের বাহুবলে, নিজের শক্তিতে তাহার ন্যায্য প্রাপ্য, অধিকার করিতে পারিবে তখনই লইবে। কিন্তু মহারাজ, আপনার এই অন্যায় আচরণের জন্য শত সহস্র নির্দ্দোষ প্রজার রক্তস্রোতে দেশ প্লাবিত হইয়া উৎসন্ন যাইবে। শত শত সহস্র সহস্র নারী অকাল বৈধব্যপ্রাপ্ত হইবে। দেশে অরাজকতা আসিবে, ক্ষেত্র সকল অনুর্ব্বর অবস্থায় পড়িয়া থাকিবে, লোক সকল অন্নাভাবে মৃত্যুমুখে পতিত হইবে। ভ্রাতৃরক্তে মিবার রাজবংশ চিরদিনের জন্য কলঙ্কিত হইয়া থাকিবে। তখন যেন আর কাহাকেও দোষী সাব্যস্ত না করেন, তখন যেন মনে থাকে যে, ইহা আপনারই কার্য্যের ফল, আপনারই পাপের ফল; মহারাজ, যে সূর্য্যবংশে রাজা দশরথ সত্য পালনের জন্য প্রাণসম পুত্র রামচন্দ্রকে বনবাস দিয়াছিলেন, সেই সূর্য্যবংশে না তোমার জন্ম? আজ তুমি সেই নিষ্কলঙ্ক সূর্য্যবংশের নাম ডুবাইলে—কিন্তু যতদিন আকাশে চন্দ্র সূর্য্যের উদয় অস্ত হইবে, ততদিন তুমি ন্যায়কে অন্যায় দ্বারা আবৃত করিতে পারিবে না। (ক্রমশঃ)

শ্রীসুধাকৃষ্ণ বাক্‌চি।

দ্বাদশবর্ষ সম্পূর্ণ।

বিশেষ দ্রষ্টব্য—সম্পাদক মহাশয়ের অসুস্থতা নিবন্ধ এবং নানা প্রকার গোলযোগে আলোচনা এই তিন মাস ক্ষুদ্র আকারে প্রকাশ হইল। যে কয় ফর্ম্মা কম পড়িল—আমরা আগামী বৈশাখ মাসে তাহা পূরণ করিয়া দিব। গ্রাহকগণের কৃপাবলে "আলোচনা" আজ দ্বাদশবর্ষ জীবিত রহিয়াছে; আগামী বর্ষে আমরা তাঁহাদের সেইরূপ কৃপালাভে বঞ্চিত হইব না ইহাই বিশ্বাস। আগামী বর্ষের উপহার ইত্যাদির বিশেষ বন্দোবস্ত করা হইবে। ম্যানেজার।